ইউনিট ১

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা
Management Thought

ভূমিকা

চিন্তা হলো জ্ঞানের যে-কোনো শাখার নির্ভরযোগ্য ধারণা। জ্ঞান বিভিন্ন পন্থায় সর্বদা উন্নত হয় এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। যে-কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জ্ঞান বিভিন্ন উৎস হতে উৎসারিত হয় এবং প্রতিটি উৎসেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। এ প্রতিটি উৎসের ধারাকেই চিন্তাধারা, অ্যাপ্রোচ বা মডেল বা স্কুল বলে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বা স্কুল বা মডেল বা অ্যাপ্রোচ হলো ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বতন্ত্র ধারা। তবে আজকের ব্যবস্থাপনা একদিনেই এ পর্যায়ে আসেনি। এটি হলো দীর্ঘ চিন্তাভাবনা ও গবেষণার ফল। সে দিক থেকে বলা যায় যে, মানব সভ্যতার ইতিহাস ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ইতিহাস পরস্পর সম্পর্কিত। আজকের ব্যবস্থাপনা যতটা সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ, শুরুতে তা ছিল না। যুগ যুগ ধরে পথ চলার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ বহু মনীষীর চিন্তাভাবনা ও গবেষণার ফলশ্রুতিতে আজ তা আধুনিক রূপ লাভ করেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, গবেষক ও মনীষীদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিভিন্ন মতামত, বিশ্বাস ও ধারণা হতেই এসেছে ব্যবস্থাপনা দর্শন, তত্ত্ব ও মতবাদ। বিভিন্ন ধারণা ও মৌলনীতির কাঠামোগত রূপই হলো তত্ত্ব (Theory), যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকবে এবং একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা বলা থাকবে। অর্থাৎ, যে বক্তব্য বা ঘটনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই, তাকে তত্ত্ব বলা যাবে না। প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবস্থাপনা ধারণাটি প্রচলিত ছিল। এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক প্রভৃতি সকল কার্যাবলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এটিকে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়। Managgiment এর বাংলা অর্থ হলো ব্যবস্থাপনা। Management শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Manegiare' হতে এসেছে যার অর্থ হলো 'to train up the horses' বা ঘোড়াকে প্রশিক্ষিত করা। এটি কালক্রমে মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ মানুষকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে তার দ্বারা কার্যসম্পাদন করা হয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য। প্রতিষ্ঠানে দু ধরনের সম্পদ ও উপকরণ নিয়োজিত থাকে, যেমন: (i) মানব সম্পদ ও (ii) যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও অন্যান্য। এগুলোকে 6M বলা যায়; যেমন: (Man, Machine, Materials, Money, Market and Method)। ব্যবস্থাপনা এ সকল সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে সহায়তা করে থাকে। আলোচ্য ইউনিটে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বিশদভাবে উপস্থাপন করা হলো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়:	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১:	ব্যবস্থাপনা শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি; ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়? ব্যবস্থাপনা অধ্যয়নের গুরুত্ব; ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য; ব্যবস্থাপক কে?
পাঠ-১.২:	ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপক; ব্যবস্থাপনার সাধারণ তত্ত্ব; ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ধারণা; ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদের উপর প্রভাবক শক্তিসমূহ
পাঠ-১.৩:	ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য; ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা উন্নয়নের ইতিহাস
পাঠ-১.৪:	ব্যবস্থাপনা স্কুল/মতবাদ/মডেল/অ্যাপ্রোচ
পাঠ-১.৫:	নব্য-ধ্রুপদী মতবাদ; অন্যান্য মতবাদ
পাঠ-১.৬:	ব্যবস্থাপনা দর্শন; ব্যবস্থাপনা দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান; ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্ম
পাঠ-১.৭:	শিল্পবিপ্লব কী? শিল্পবিপ্লবের কারণ; এ সময়ে বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন
পাঠ-১.৮:	শিল্পবিপ্লবের ফলাফল, শিল্পবিপ্লব ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে গতিশীলতা সৃষ্টি করেছিল - ব্যাখ্যা
পাঠ-১.৯:	শিল্পবিপ্লবের সীমাবদ্ধতা, সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি, শিল্পের ক্রম বিবর্তনের ধারা ১.০ থেকে ৪.০

পাঠ-১.১ ব্যবস্থাপনা শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি, ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়? ব্যবস্থাপনা অধ্যয়নের গুরুত্ব; ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য; ব্যবস্থাপক কে?

Meaning and the Origin of the Word Management; What is meant by Management? Importance of the Study of Management as a Subject, Nature of Characterstics of Management; Who is Manager?

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবস্থাপনা শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি বলতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায় তা জানতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনা অধ্যয়নের গুরুত্ব শিখতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপকের পরিচয় বলতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি

Meaning and the Origin of the Word Management

ইংরেজি Management সর্বজনীনভাবে পরিচিত ও ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় শব্দ। এ শব্দটি দ্বারা কী বুঝানো হয়, তা সকল শ্রেণির মানুষের নিকটই সহজবোধ্য। আর তাই তো স্থান, কাল, পাত্রভেদে সমাজ জীবনের সকল স্তরে ও ক্ষেত্রে Management শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

Management শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা বিশারদদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। অধিকাংশের মতে ল্যাটিন Maneggiare শব্দের পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে ইংরেজি Management শব্দটি। কারণ তৎকালে ইতালি ও ইউরোপের ল্যাটিন অঞ্চলে Maneggiare শব্দটি বহুল ব্যবহৃত ছিল এবং এ শব্দ দ্বারা তখন ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া (to train up the horses) বা কোনো কিছু চালনা বা পরিচালনা (to handle) করাকে বুঝানো হতো। আর তাই তাঁদের মতে বহুল ব্যবহারের ফলে কালক্রমে ল্যাটিন Maneggiare শব্দটিই Management শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।

আভিধানিক অর্থে Manage ও Management শব্দ দ্বারা চালনা করা, সামলানো বা সামলিয়ে নেওয়া, ব্যবস্থা করা, সুযোগের সদ্ব্যবহার করা, মানিয়ে নেওয়া এবং ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদিকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ, ইংরেজি Management একাধিক অর্থবোধক একটি প্রায়োগিক শব্দ। তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

আবার অনেকের ধারণা Menager (পরিবার চালনা) এবং প্রাচীন ইংরেজি Menage (প্রদর্শন/নির্দেশ) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে Management শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। যাহোক, বাংলায় Management শব্দের পরিভাষা করা হয়েছে ব্যবস্থাপনা। এর দ্বারা কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়াকে বুঝায়। অর্থাৎ, কোনো কার্য সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার কলাকৌশল বা প্রক্রিয়াই হচ্ছে ব্যবস্থাপনা।

আবার, Management শব্দটিকে আমরা Manage+Men+T এ তিনটি অংশে বিন্যাস করে আলোচনা করতে পারি। এখানে Manage দ্বারা ব্যবস্থা করা, Men দ্বারা মানুষ বা কর্মী এবং T দ্বারা কৌশলকে (Tactfulness) বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানব শক্তির কৌশলগত ব্যবহারিক প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা বলা হয় (Manage men tactfully)।

ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়?

What is meant by Management?

প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবস্থাপনা ধারণাটি প্রচলিত ছিল। এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক প্রভৃতি সকল কার্যাবলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এটিকে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়।

Management এর বাংলা অর্থ হলো ব্যবস্থাপনা। Management শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Maneggiare' হতে এসেছে; যার অর্থ হলো 'to train up the horses' বা ঘোড়াকে প্রশিক্ষিত করা। এটি কালক্রমে মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ মানুষকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে তার দ্বারা কার্যসম্পাদন করা হয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য। প্রতিষ্ঠানে দু ধরনের সম্পদ ও উপকরণ নিয়োজিত থাকে, যেমনঃ (i) মানব সম্পদ ও (ii) যন্ত্রপাতি, কাঁচামালল ও অন্যান্য। এ গুলোকে 6M ও বলা যায়; যেমনঃ (Man, Machine, Materials, Money, Market and Method)। ব্যবস্থাপনা এ সকল সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে সহায়তা করে থাকে। সুতরাং সহজভাবে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা হলো অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার একটি প্রক্রিয়া বা কৌশল যাতে সহজেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জিত হয়। বিভিন্ন মনীষী ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নীচে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো :

হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol) এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা করা, সংগঠিত করা, আদেশ-নির্দেশ দেওয়া, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা।" (Management is to forecast and plan, to organise, to command, to co-ordinate and control)

হিকস্ (Hicks) এর মতে, "অন্যের দ্বারা এবং মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াই হলো ব্যবস্থাপনা।" (Management is the process of getting things done by and through others)

Terry & Franklin-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হলো পরিকল্পনা, সংগঠন, প্রেষণাদান এবং নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়া যেন মানুষ ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও সম্পাদন করা যায়।" (Management is a distinct process consisting of activities of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives with the use of human beings and other resources.)

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপনার কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে; যেমনঃ

(i) এটি কার্যসম্পাদনে একটি প্রক্রিয়া;
(ii) এটি হলো একগুচ্ছ জ্ঞানের সমাহার; যা ব্যবহার করে ব্যবস্থাপনা কার্য হাসিল করে।
(iii) এটি সাংগঠনিক লক্ষ্যার্জনের দিকে নজর দেয়;
(iv) এটি অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে ও অন্যান্য সম্পদ কাজে লাগিয়ে লক্ষ্যার্জন করে।

সুতরাং বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদসমূহ দক্ষ ও ফলপ্রসূভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জন করা যায়। নীচে চিত্রের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকে উপস্থাপন করা হলোঃ

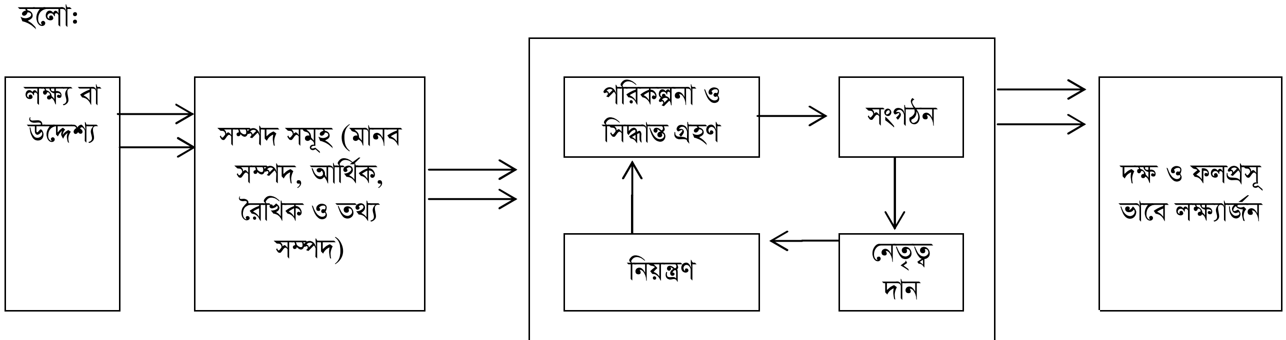

চিত্র : প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র হিসাবে অধ্যয়নের গুরুত্ব

Importance of the Study of Management as a Subject
অথবা, ব্যবস্থাপনা কেন অধ্যয়ন করা হয়
Why is Management Studied

বিশ্বায়নের এ যুগে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। কারণ এটি এমন একটি বিষয় যা ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। পরিবার থেকে শুরু করে ব্যবসায়, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এমনকি রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানার্জন করা একান্ত আবশ্যক। বর্তমানে জটিল ব্যবসায়িক পরিবেশে ব্যবস্থাপনার দক্ষ ব্যক্তিবর্গের কদর বাড়ছে। সর্বত্র এখন ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ করা হচ্ছে, তাই ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধ্যয়নের কোনো বিকল্প নাই। নীচে ব্যবস্থাপনা বিষয় অধ্যয়নের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

১। **সম্পদ সংগ্রহ (Procurement of resources):** প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হলে উন্নত মানের উপকরণসহ পর্যাপ্ত সম্পদ প্রয়োজন। উপকরণ দু'ধরনের হয়, মানবীয় ও অ-মানবীয় (কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি) দক্ষ জনশক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যতিত উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। কেবল দক্ষ ব্যবস্থাপনার পক্ষেই এগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব। শুধু সম্পদ সংগ্রহ করলেই হবে না, তা যথোপযুক্ত ও উন্নতমানের হতে হবে।

Terry and Frunklin বলেন, "ব্যবস্থাপনা মানবীয় প্রচেষ্টাকে আরও উৎপাদনশীল করে। এটি আমাদের সমাজের জন্য ভালো সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, অফিস, পণ্য, সেবা এবং মানবীয় সম্পর্ক আনয়ন করে। উন্নয়ন ও অগ্রগতি হলো এর স্থায়ী নীতিবাক্য।" (Management makes human efforts more productive it brings better equipments, plants, offices, products, services and human relation to our society. Improvement and progress are its constant watchwords.)

২। **সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার (Utilization of resources):** শুধু পর্যাপ্ত সম্পদসমূহ সংগ্রহ করলেই হবে না, এ গুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহার প্রয়োজন। একমাত্র সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পারে প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের উপকরণসহ অন্যান্য সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে। আর তাই আজকাল উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের ন্যায় ব্যবস্থাপনাকে অন্যতম উপকরণ হিসাবে গণ্য করা হয়। সুতরাং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে ও জানতে হবে।

৩। **জটিল ব্যবসায়িক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো (Adapting to complex business environment):** বিশ্বায়নের এ যুগে ব্যবসায়িক পরিবেশ অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন, মানব সম্পদের উন্নয়ন, শ্রমের বিশেষায়ন ও বৃহদায়তন উৎপাদন, শিল্প-সম্পর্কের জটিলতা বৃদ্ধি, তীব্র প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়িক পরিবেশ অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ছে। আর তাই ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা বিষয় অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪। **বৃহদায়তন উৎপাদন (Large scale production):** বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই বহুজাতিক কোম্পানিসহ অন্যান্য বড় বড় কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং ব্যবসায় পরিচালনা করছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তান পণ্য উৎপাদন ও তা বিশ্বব্যাপী বণ্টন করে থাকে। এক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। কারণ বিশ্বব্যাপী চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষা করে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, পণ্যের মানোন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ, আমদানি-রপ্তানি পরিচালনা প্রভৃতি কার্য সূচারুরূপে সম্পাদন করতে হলে ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী হতে হবে। এ কারণে ব্যবস্থাপনা বিষয় অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

৫। **আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার (Use of modern technology):** বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা আবশ্যক। বিশেষ করে নতুন পণ্য উদ্ভাবন , পণ্যের মানোন্নয়ন, আকর্ষণীয় মোড়কীকরণ, বেশি করে উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নাই। এ ছাড়াও পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এ সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন রয়েছে।

৬। **শিল্পোন্নয়ন (Industrial development):** ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, শিল্পের উন্নয়নের সাথে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কারণ ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনারও উন্নয়ন ঘটেছে। তাই শিল্পোন্নত দেশে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। কারণ নতুন শিল্প স্থাপন, পুরাতন শিল্পের উন্নয়ন, শিল্প-সম্পর্কের উন্নয়ন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণ প্রভৃতি পর্যায় অতিক্রম করে সত্যিকার শিল্পের উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য। ব্যবস্থাপনার শাস্ত্র পাঠ করলে সকল বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব।

৭। **অপচয় দূরীকরণ (Eliminating wastage):** উৎপাদনের উপকরণের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপচয় হ্রাস করা সম্ভব। এতে মিতব্যয়িতা অর্জিত হবে। স্বল্প সময়ে স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারলেই অপচয় দূরীভূত হবে এবং মিতব্যয়িতা অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা জ্ঞান অপরিহার্য। কারণ ব্যবস্থাপনা অপ্রয়োজনীয় খাতসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীভূত করে থাকে। এতে অতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস পায় ও অপচয় দূর হয়।

৮। **শিল্প-সম্পর্ক উন্নয়ন (Improvement of industrial relation):** প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মী ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে শিল্প-সম্পর্ক বলে। এ সম্পর্ক যে প্রতিষ্ঠানে যত ভালো সে প্রতিষ্ঠান তত সহজে লক্ষ্যার্জন করতে সক্ষম হয়। এ সম্পর্ক উন্নতি করতে ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯। **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (Increase productivity):** স্বল্প সময়ে কাঁচামাল ব্যবহার করে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করার কৌশলকে উৎপাদনশীলতা বলে। তীব্র প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

১০। **সামাজিক দায়িত্ব পালন (Perform social responsibilities):** যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের সমাজের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। সমাজের প্রতি দায়িত্ব কীভাবে সফলতার সাথে পালন করা যায় সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার তত্ত্বীয় জ্ঞানের প্রয়োজন। এ কারণে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা একান্ত আবশ্যক।

১১। **ব্যবস্থাপনা পেশার উন্নয়ন (Development management as a profession):** বিশ্বায়নের এ যুগে ব্যবস্থাপনা একটি পেশা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। কারণ জটিল ব্যবসায় পরিবেশে প্রতিষ্ঠানকে সফলতার সাথে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের কোনো বিকল্প নাই। এ কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবস্থাপনা জ্ঞানে বিশেষায়িত লোকদেরকে ভালো বেতন-ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাসহ নিয়োগ দিচ্ছে। উন্নত-অনুন্নত সকল দেশেই ব্যবস্থাপক হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে অনেকেই ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পরিবার, ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষেত্রসমূহ সর্বত্রই ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। আর এ জন্য ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র অধ্যয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে **J. L. Massire** বলেন, “ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কারণ শ্রম অধিক বিশেষায়িত হয়েছে এবং কার্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রতিনিয়ত নতুন হুমকির সৃষ্টি করেছে। মানবীয় সম্পর্কের জটিলতায় ব্যবস্থাপক কার্যসম্পাদনকারীগণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সুতরাং ব্যবস্থাপনার গতিশীলতা এর তত্ত্ব ও প্রয়োগ অধ্যয়নের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। (Management has become more important as labour has become more specilized and as the scale of operations has increased. Technological developments have continually created new chanllenges. The complexities of human relation constantly challenge those who perform mangerial function. The dynamics of mangement therefore should be characteristics of any study of its theory and practice.)

ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য

Nature of Characterstics of Management

একটি প্রতিষ্ঠানে মানবীয় ও অ-মানবীয় সম্পদ থাকে। ব্যবস্থাপনার কাজ হলো প্রতিষ্ঠানের এ সম্পদ কার্যে প্রয়োগ করে উদ্দেশ্যার্জন করা। তাই ব্যবস্থাপনা অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, যেন সাবলীলভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন করা যায়।

প্রতিষ্ঠান যে ধরনেরই হোক না কেন, ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম। কারণ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য একটাই, তা হলো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জন করা। নীচে ব্যবস্থাপনার কতিপয় প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

১। **ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া (Management is a process)**: প্রক্রিয়া হলো কতিপয় উপাদানের সমাহার যা চক্রাকারে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় এবং ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। **Stoner** তাঁর সহযোগীরা বলেন, "প্রক্রিয়ার অর্থ হলো কার্য-পরিচালনার একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি।" (Process means a systematic method of handling activities.) ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উপাদানগুলো হলো পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ। প্রক্রিয়ার এ উপাদানগুলোর সাহায্যে উৎপাদনের উপকরণ, যেমন: মানুষ, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, অর্থ, পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যবহার করে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জন করে থাকে। এ জন্য ব্যবস্থাপনাকে একটি প্রক্রিয়া বলা হয়। আর যিনি এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন, তাকে ব্যবস্থাপক বলা হয়।

২। **ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্যমুখী (Objective oriented)**: প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কীভাবে অর্জন করা হলো তার উপর ব্যবস্থাপনার সফলতা মূল্যায়ন করা হয়। ব্যবস্থাপনা দ্বারা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কার্যসমূহ সম্পাদন করা হয় বিধায় এর অস্তিত্ব বুঝা যায়। সুতরাং ব্যবস্থাপনা সবসময় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করে। এ জন্য বলা হয় Management is purpose oriented.

৩। **ব্যবস্থাপনা কার্যে বিশ্বাসী (Management makes things happen)**: ব্যবস্থাপনা সফলতার সাথে কার্যসম্পাদনের উপর গুরুত্বারোপ করে। ব্যবস্থাপনা জানে যে, কোথায় শুরু করতে হবে, কোনো জিনিসকে সচল রাখতে কি করতে হবে এবং কীভাবে সর্বত্র অনুসরণ করতে হবে। সফল ব্যবস্থাপনার কার্যসম্পাদনের জন্য তাগিদ থাকে সব সময়। সুতরাং কথায় বিশ্বাসী না হয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যসম্পাদনই ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়।

৪। **কার্যসম্পাদনের উপায় (Means of accomplishment)**: ব্যবস্থাপনা হলো উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কার্যসম্পাদনের প্রক্রিয়া। সফলতার সাথে কার্যসম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপকগণ পুরস্কৃত হতে পারেন। সুতরাং কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যেই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। **Prof. Hodgets** বলেন, "ব্যবস্থাপনা হলো উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনের জন্য কর্মীদের প্রচেষ্টাকে সমন্বিতকরণ প্রক্রিয়া।" (Management is the process of setting objective and co-ordination the efforts of personnel in order to attain them.)

৫। **দলীয় প্রচেষ্টা (Group effort)**: ব্যবস্থাপনা একক প্রচেষ্টার চেয়ে দলীয় প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা দলীয় কার্যক্রমে অত্যন্ত সফল ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। **হথর্ণ গবেষণা** (Howthorne Studys) তার প্রমাণ। সুতরাং এটি সুস্পষ্ট যে, ব্যবস্থাপনা দলীয় কার্যক্রমে উত্তম ভূমিকা রাখে। এ ব্যাপারে **Terry and Franklin** বলেন, "এটিই স্বাভাবিক যে, ব্যবস্থাপনা দলের সাথে সম্পৃক্ত।" (Its human to associate management with group).

৬। **ব্যবস্থাপনা অদৃশ্য (Management is intangible)**: বলা হয় যে, ব্যবস্থাপনা হলো অদৃশ্য। কারণ এর প্রচেষ্টা, শৃঙ্খলা, উদ্দেশ্য সম্পর্কিত কর্মীর অর্জিত সফলতাই কেবল এর সাক্ষ্য বহন করে। আবার, যদি কোথাও অব্যবস্থাপনা দেখা যায়, তাহলে সেখানে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। এ জন্যই বলা হয় যে, ব্যবস্থাপনা অদৃশ্য।

৭। **অর্থনৈতিক সম্পদ (Economic wealth)**: ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন কারণে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের সফলতায় ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অপরিসীম। কারণ ব্যবস্থাপনা দক্ষতার অভাবে অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যর্থতায় ডুবে যাওয়ার প্রমাণ রয়েছে। তাই **Herbison** ও **Myers** বলেন, "ব্যবসায়ে নিয়োজিত উপকরণ ও মূলধনের ন্যায় ব্যবস্থাপনা হলো অর্থনৈতিক সম্পদ।"

৮। **জ্ঞানের বিশেষ শাখা (Special branch of knowledge)**: ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের একটি আলাদা শাখা। আধুনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কৃত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর সর্বত্রই এটি এখন জ্ঞানের বিশেষ শাখা হিসাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এতে দক্ষ পেশাদার ব্যবস্থাপনা বিশারদ গ্রুপ তৈরি হচ্ছে যারা বড় বড় কোম্পানিতে সফলতার সাথে ব্যবস্থাপনার কার্যসম্পাদিত করতে সক্ষম হচ্ছে।

৯। **কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব (Authority and responsibility)**: কর্তৃত্বের অর্থ হলো কাজের অধিকার লাভ করা এবং দায়িত্বের অর্থ হলো জবাবদিহিতা। ব্যবস্থাপনায় কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ কর্তৃত্বারোপ ব্যতীত

উচ্চ ব্যবস্থাপনা সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে না। এ জন্য কর্তৃত্ব অর্পন করতে হয় নিচের দিকে। আবার, কর্তৃত্বের সাথে দায়িত্বও সমভাবে দিতে হবে। নইলে অর্পিত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে না। সুতরাং যারা কর্তৃত্ব ভোগ করে, তাদের দায়িত্বও বেশি।

১০। **মানুষের জীবন-মান উন্নয়নের উত্তম উপায় (Outstanding means to improve the quality of human life):** প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিবেশ উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে যেন কর্মীরা কার্যে উদ্বুদ্ধ হয়। ভালো পরিবেশে কাজ করতে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং তখন কর্মীগণ নিজেদের জীবনমান উন্নয়নের চেষ্টা করে। একজন ব্যবস্থাপক জীবনে ভালো জিনিস অর্জনে দলের সদস্যদের বা প্রতিষ্ঠানেরর কর্মীদেরকে সাহায্য করতে পারে। এভাবে ব্যবস্থাপনা প্রকারান্তরে মানুষের জীবনমান উন্নয়নের অন্যতম উপায় হিসাবে কাজ করে।

১১। **সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process):** ব্যবস্থাপনা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। কারণ ব্যবস্থাপনা সমাজ থেকে কর্মীসংগ্রহ করে তাদের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তাদের কার্যকে সমন্বিত আকারে প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জন করা সহজ হয়।

১২। **সর্বজনীনতা (Universality):** ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতা অর্থ হলো ব্যবস্থাপনা পরিবার থেকে শুরু করে শিল্পপ্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় পর্যায় সর্বত্রই সমভাবে বিরাজমান। এ ছাড়া, এটি প্রাচীন কালেও বিদ্যমান ছিল এবং এখনো আছে। ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি ও নীতিমালা সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে প্রয়োগিক কৌশল ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা সার্বজনীন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ হয়ে নিজস্ব জ্ঞানের আলোয় আলোকিত একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। যে-কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠানেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ব্যবস্থাপনার সফলতার উপরই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন নির্ভর করে।

ব্যবস্থাপক কে?
Who is Manager?

ব্যবস্থাপক হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য দায়ী থাকেন। ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, বিভিন্ন সম্পদ সংগঠিত করেন, নেতৃত্ব দেন ও সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করেন। এ সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য ব্যবস্থাপককে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। এ দুটি উপাদানের সমন্বয় ঘটিয়ে যে কেউ দক্ষ ব্যবস্থাপক হতে পারেন। কীভাবে এ দুটি উপাদান কাজ করে তা নিচের চিত্রে দেখানো হলো:

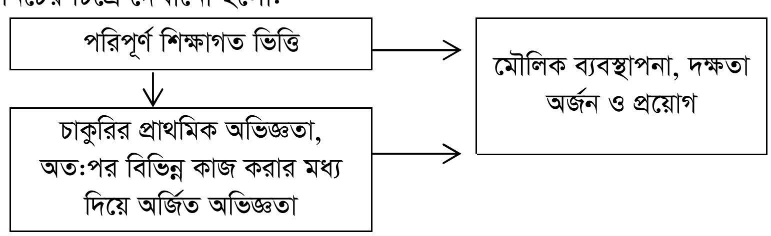

চিত্র: ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উৎস।

উৎস: Griffin, R. W. "Management, 7th edition. p-23"

ব্যবস্থাপককে সবসময় চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। বিভিন্ন দিক থেকে তার উপর প্রচণ্ড চাপ থাকে। তিনি অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নাই। তিনি তার দলের সদস্যদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন। সুতরাং বলা যায় যে, তিনিই ব্যবস্থাপক যিনি অন্যদের কাজ তদারকি করেন ও অন্যের কাজের জন্য দায়ী থাকেন এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য যিনি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, নির্দেশ ও পরামর্শ দেন, সম্পদের যোগান নিশ্চিত করেন এবং বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন, সর্বোপরি যিনি সার্বিকভাবে দক্ষতা অর্জন করেন।

Chamber's 20th Century Dictionary - তে বলা হয়েছে, "Manager is a person who controls a business or other concern." অর্থাৎ ব্যবস্থাপক হচ্ছেন, এমন একজন ব্যক্তি, যিনি কোনো ব্যবসায় বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

আবার, Ernest Dale তাঁর "Management: Therory and Practice" বইতে বলেছেন, "The manager is an arbiter among the many interests or publics affected by the business." অর্থাৎ, ব্যবস্থাপক হচ্ছেন ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী বা জনগণের সালিশ।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ ব্যবস্থাপনা শব্দের অর্থ, উৎপত্তি, সংজ্ঞা, ব্যবস্থাপনা অধ্যয়নের গুরুত্ব, ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য ও ব্যবস্থাপক কে - এ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনাপূর্বক জ্ঞান ঝালাই করুন।

সারসংক্ষেপ

Management শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা বিশারদদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। অধিকাংশের মতে ল্যাটিন Maneggiareশব্দের পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে ইংরেজি Management শব্দটি। কারণ তৎকালে ইতালি ও ইউরোপের ল্যাটিন অঞ্চলে Maneggiare শব্দটি বহুল ব্যবহৃত ছিল এবং এ শব্দ দ্বারা তখন ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া (to train up the horses) বা কোনো কিছু চালনা বা পরিচালনা (to handle) করাকে বুঝানো হতো। আর তাই তাঁদের মতে বহুল ব্যবহারের ফলে কালক্রমে ল্যাটিন Maneggiare শব্দটিই Management শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে Manage ও Management শব্দ দ্বারা চালনা করা, সামলানো বা সামলিয়ে নেওয়া, ব্যবস্থা করা, সুযোগের সদ্ব্যবহার করা, মানিয়ে নেওয়া এবং ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদিকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ ইংরেজি Management একাধিক অর্থবোধক একটি প্রায়োগিক শব্দ। তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবস্থাপনা ধারণাটি প্রচলিত ছিল। এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক প্রভৃতি সকল কার্যাবলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এটিকে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়। Management এর বাংলা অর্থ হলো ব্যবস্থাপনা। Management শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Manegiare' হতে এসেছে যার অর্থ হলো 'to train up the horse' বা ঘোড়াকে প্রশিক্ষিত করা। এটি কালক্রমে মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ মানুষকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁর দ্বারা কার্যসম্পাদন করা হয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য। প্রতিষ্ঠানে দু ধরনের সম্পদ ও উপকরণ নিয়োজিত থাকে, যেমন: (i) মানব সম্পদ ও (ii) যন্ত্রপাতি, কাঁচামালল ও অন্যান্য। এগুলোকে 6Mও বলা যায়, যেমনঃ (man, machine, materials, money, market and method)। ব্যবস্থাপনা এ সকল সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে সহায়তা করে থাকে।বিশ্বায়নের এ যুগে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। কারণ এটি এমন একটি বিষয় যা ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। পরিবার থেকে শুরু করে ব্যবসায়, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে এমনকি রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানার্জন করা একান্ত আবশ্যক। বর্তমানে জটিল ব্যবসায়িক পরিবেশে ব্যবস্থাপনার দক্ষ ব্যক্তিবর্গের কদর বাড়ছে। সর্বত্র এখন ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ করা হচ্ছে, তাই ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধ্যয়নের কোনো বিকল্প নাই। একটি প্রতিষ্ঠানে মানবীয় ও অ-মানবীয় সম্পদ থাকে। ব্যবস্থাপনার কাজ হলো প্রতিষ্ঠানের এ সম্পদ কার্যে প্রয়োগ করে উদ্দেশ্যার্জন করা। তাই ব্যবস্থাপনা অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, যাতে সাবলীলভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন করা যায়। প্রতিষ্ঠান যে ধরনেরই হোক না কেন, ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম। তিনিই ব্যবস্থাপক যিনি অন্যদের কাজ তদারকি করেন ও অন্যের কাজের জন্য দায়ী থাকেন এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য যিনি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, নির্দেশ ও পরামর্শ দেন, সম্পদের যোগান নিশ্চিত করেন এবং বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন, সর্বোপরি যিনি সার্বিকভাবে দক্ষতা অর্জন করেন।

পাঠ-১.২

ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপক; ব্যবস্থাপনার সাধারণ তত্ত্ব; ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ধারণা; ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদের উপর প্রভাবক শক্তিসমূহ

Management & Manager, A General Theory of Management; Management Thought– Concept; The forces that Influence Management Theory Approach

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপক সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনার সাধারণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদের উপর প্রভাবক শক্তিসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপক

Management & Manager

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। এ উদ্দেশ্যার্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানকে নানাবিধ কাজ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানে বস্তুগত (কাঁচামাল, মেশিনারিজ, দালানকোঠা, অন্যান্য সম্পদ) ও অবস্তুগত সম্পদ (মানব সম্পদ যেমন: কমচারী, কর্মকর্তা, শ্রমিকগণ) ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দেশ্যার্জনের জন্য যে সকল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় তা-ই ব্যবস্থাপনা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol) বলেছেন, "ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা করা, সংগঠিত করা, আদেশ-নির্দেশ দেওয়া, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা।" (Management is to forecast and plan, to organise, to command, to co-ordinate and control)

F. W. Taylor বলেছেন, "মানুষ কি করতে চায় তা প্রকৃতপক্ষে জানা এবং তা স্বল্পব্যয়ে ও সর্বোত্তম উপায়ে সমাধান করার প্রক্রিয়াই হলো ব্যবস্থাপনা।

G. R. Terry & Franklin-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হলো পরিকল্পনা, সংগঠন, উৎসাহিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের এমন এক স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া যা জনশক্তি ও সম্পদসমূহ ব্যবহারের উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণ ও অর্জনের জন্য প্রয়োগ করা হয়।"

এইভাবে বহু মনীষী নানাভাবে ব্যবস্থাপনাকে সংজ্ঞায়িত ও বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। সেই প্রাচীন কাল হতে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত অগণিত মনীষী, পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ, মনস্তত্ত্ববিদ, ব্যবস্থাপনাবিদগণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বহু আলোচনা, গবেষণা, তত্ত্ব, মডেল প্রভৃতি প্রদান করেছেন। যার কারণে একজন প্রখ্যাত ব্যবস্থাপনাবিদ ব্যবস্থাপনাকে "জঙ্গল তত্ত্ব" নামে অভিহিত করেছেন।

বিভিন্ন সময়ে বা যুগে ব্যবস্থাপনার ধরন এক এক রকম ছিল। তাই ব্যবস্থাপকগণও সময়ের প্রয়োজন বুঝে ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া বা জ্ঞান কর্মীদের উপর প্রয়োগ করতেন। যেমন: প্রাচীন কালে বা মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন ছিল যে, তখন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রতি মানবীয় আচরণ প্রদর্শনের সুযোগ ছিল না। প্রতিষ্ঠানেরর শ্রমিক-কর্মীদেরকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হতো।

আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনার পরিবেশ প্রাচীন বা মধ্যযুগের ঠিক বিপরীত। সুতরাং পূর্বযুগে ব্যবস্থাপনার কার্য পরিচালনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং যোগাযোগ করা যতটা সহজ ছিল, বর্তমানকালে তা সম্ভব নয়। এ কালের ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করা অনেক কঠিন কাজ। ব্যবস্থাপকদেরকে চতুর্মুখী বিষয় মাথায় রেখে বা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ: প্রাচীন ও মধ্যযুগে ব্যবস্থাপকগণ যে কোনো পরিবেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন এবং শ্রমিক-কর্মীগণ তা মেনেও নিতেন। কিন্তু আধুনিক যুগ বা বর্তমান সময়ে তা সম্ভব নয়। এই জন্য

ব্যবস্থাপকদের এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন শ্রমিক-কর্মীগণ কাজে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জনের লক্ষ্যে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য পরিচালিত সকল কার্যক্রমই ব্যবস্থাপনা।

এখন দেখা যাক ব্যবস্থাপক কে এবং তার বা তাদের কাজ কী? সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল কাজ হয়, তা পরিচালনাকারী হলো ব্যবস্থাপক। আবার অন্যভাবে বলা যায়, যিনি প্রতিষ্ঠানের অন্য লোকদের কাজ সংগঠিত করেন, তিনিই ব্যবস্থাপক। তাহলে দেখা যায় যে, কাজকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার জন্য ব্যবস্থাপককে যে কাজগুলো করতে হয়, তা হলো: পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন, প্রেষণাদান, নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি।

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কাজ করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ব্যবস্থাপকগণ কী কাজ করেন যেমন: এফ.ডব্লিউ টেলর ও তাঁর অনুসারীরা মনে করেন যে, ব্যবস্থাপকগণ শুধু কারখানা পরিকল্পনা করেন। আবার, হেনরি ফেয়ল ব্যবস্থাপকের কাজকে জটিল প্রশাসনিক কাজ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকে ব্যবস্থাপককে একজন পরিচালক বা প্রশাসন বা মানব সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

বর্তমান সময়ের ব্যবস্থাপকদেরকে কোনো নির্দিষ্ট বিশেষণে আখ্যায়িত করা যাবে না। কারণ তারা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কিংবা আচরণবাদী ব্যবস্থাপনা বা সংখ্যাত্মক ব্যবস্থাপনার কোনোটিই এককভাবে ব্যবহার করেন না।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, এক এক যুগে ব্যবস্থাপনার ধরন, বিশেষজ্ঞদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা একেক রকম ছিল। তাই সাম্প্রতিক সময়ের ব্যবস্থাপকগণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, আচরণবাদী, মনস্তাত্ত্বিক, সংখ্যাত্মক ইত্যাদি অ্যাপ্রোচসমূহের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি পরিচালনা করেন। যদিও ব্যবস্থাপনার কার্য পরিচালনার কোনো সাধারণ বা সুনির্দিষ্ট কোনো তত্ত্ব এখনো কেউ দিতে পারেনি।

ব্যবস্থাপনার সাধারণ তত্ত্ব

A General Theory of Management

ব্যবস্থাপনার সাধারণ তত্ত্ব বলতে এমন তত্ত্বকে বুঝায় যা সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকগণ অনুসরণ করেন এবং এটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে সহায়ক হয়। একটি প্রতিষ্ঠানে সকল বিভাগ সমন্বিতভাবে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবে এবং ব্যবস্থাপক তা বাস্তবায়নের যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। কর্মীদেরকে কার্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে ব্যবস্থাপকদেরকে দুটি কাজ করতে হয়, যেমন:

(i) কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা।
(ii) কর্মীদের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

(i) কর্মপরিবেশ সৃষ্টি: ব্যবস্থাপকদেরকে মনে রাখতে হবে যে, কর্মীদেরকে কাজ করার নির্দেশ দিলেই হয় না। তার জন্য সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত আলো, তাপ, শব্দ, বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে স্থাপন প্রভৃতি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এতে শ্রমিক-কর্মচারীরা আনন্দমুখর পরিবেশ উৎপাদনমুখী মন নিয়ে কাজ করতে পারে। এ কাজটি করতে ব্যবস্থাপকগণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হতে ধারণা গ্রহণ করতে পারেন। কারণ এ ব্যবস্থাপনায় কারখানা পরিকল্পনা ও বিন্যাসের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

(ii) কর্মীদের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো:কর্মীদের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন বলতে বুঝায় কাজের প্রতি কর্মীদের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা। কর্মীদের মনে এ ধারণা দিতে হবে যে, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জিত হলে সে বা তারা কি সুবিধা পাবে। একবার যদি কর্মীরা এটি অনুধাবন করতে পারে, তা হলে তারা কাজের প্রতি আগ্রহী হবে। এ ক্ষেত্রে কর্মীর ব্যক্তিক উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বিত করতে হবে। তা হলে দক্ষ কর্মীগণ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যেতে চাইবে না।
উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবস্থাপকের প্রধান কাজ হলো: একটি সুষ্ঠু ভৌত ও মানসিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে কর্মীরা স্বত:স্ফূর্ত হয়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জনের জন্য নিজেদেরকে সমর্পণ করে। এটিই হওয়া উচিত ব্যবস্থাপনার সাধারণ তত্ত্ব।

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ধারণা

Management Thought - Concept

চিন্তা হলো জ্ঞানের যে-কোনো শাখার নির্ভরযোগ্য ধারণা। জ্ঞান বিভিন্ন পন্থায় সর্বদা উন্নত হয় এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। যে-কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জ্ঞান বিভিন্ন উৎস হতে উৎসারিত হয় এবং প্রতিটি উৎসেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। এ প্রতিটি উৎসের ধারাকেই চিন্তাধারা, অ্যাপ্রোচ বা মডেল বা স্কুল বলে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বা স্কুল বা মডেল বা অ্যাপ্রোচ হলো ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বতন্ত্র ধারা।

তবে আজকের ব্যবস্থাপনা একদিনেই এ পর্যায়ে আসেনি। সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ব্যবস্থাপনা আধুনিক রূপ লাভ করেছে। এটি হলো দীর্ঘ চিন্তাভাবনা ও গবেষণার ফল। সে দিক থেকে বলা যায় যে, মানব সভ্যতার ইতিহাস ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ইতিহাস পরস্পর সম্পর্কিত। আজকের ব্যবস্থাপনা যতটা সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ, শুরুতে তা ছিল না। যুগ যুগ ধরে পথ চলার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ বহু মনীষীর চিন্তাভাবনা ও গবেষণার ফলশ্রুতিতে আজ আধুনিক রূপ লাভ করেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, গবেষক ও মনীষীদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিভিন্ন মতামত, বিশ্বাস ও ধারণা হতেই এসেছে ব্যবস্থাপনা দর্শন, তত্ত্ব ও মতবাদ। বিভিন্ন ধারণা ও মৌলনীতির কাঠামোগত রূপই হলো তত্ত্ব (Theory), যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকবে এবং একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা বলা থাকবে। অর্থাৎ যে বক্তব্য বা ঘটনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই, তাকে তত্ত্ব বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে Weihrich ও Koontz বলেন, "তত্ত্ব হলো পরস্পর নির্ভরশীল ধারণা ও নীতির পদ্ধতিগত দলবদ্ধকরণ, যা জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের কাঠামো তৈরি করে বা একত্রে গ্রথিত করে।" (Theory is a systematic grouping of interdependent concepts and principles that gives a frame work to, or ties together a signifcant area of knowledge.)

Show and Constant এর মতে, "বৃহৎ পরিসরে বিবৃতি বা প্রস্তাবসমূহের উপাত্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যা উদ্ভাবিত হয়, তা-ই তত্ত্ব। (A theory permits us to handle large amounts of empirical data with relatively few proposition.)

ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব হলো ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ধারণা, বিশ্বাস ও অনুমানসমূহের প্রায়োগিক দিকসমূহ, যার কার্যকারণ সম্পর্ক (causal relationship) বিদ্যমান এবং যা সত্য ও বাস্তবসম্মত। অন্যদিকে, সময়ের প্রেক্ষিতে এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় উদ্ভাবিত তত্ত্বসমূহকে প্রায়োগিক মূল্য বিবেচনায় বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যার এক একটি ভাগকে অ্যাপ্রোচ বা মতবাদ বলা হয়। প্রতিটি অ্যাপ্রোচেরই স্বতন্ত্র কর্মনৈপুণ্য, প্রায়োগিক মূল্যা, স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান।

কালোতিক্রমে ব্যক্তি/গোষ্ঠী/চিন্তা বা অবদান কীভাবে তত্ত্ব আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার একটি ধারাবাহিক সম্পর্ক প্রবাহ নীচে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

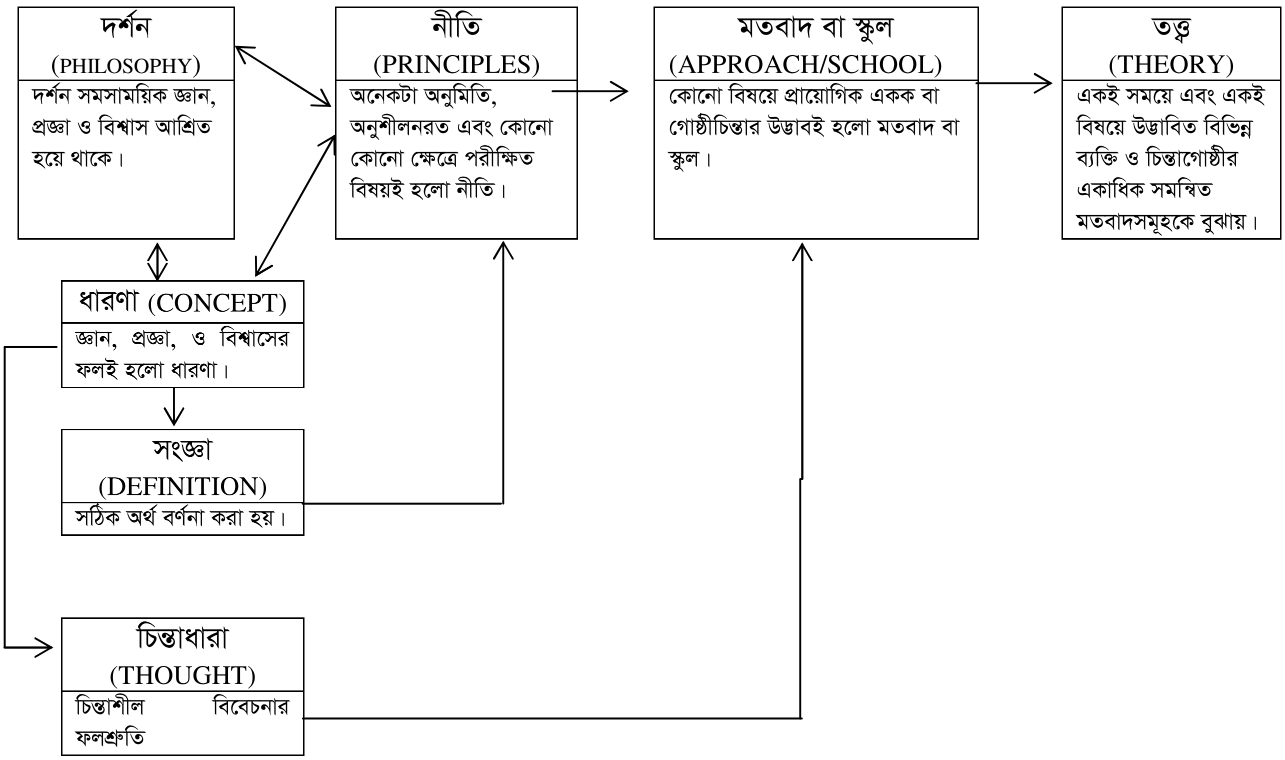

চিত্র : ব্যক্তি, চিন্তা বা অবদান কীভাবে তত্ত্ব আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় তার ধারাবাহিক সম্পর্ক প্রবাহ

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যুগ যুগ ধরে উদ্ভাবিত ব্যবস্থাপনাবিদ, গবেষক ও চিন্তা-গোষ্ঠীর মতামত, ধারণা ও বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও প্রয়োগ এবং পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমন বিষয়বস্তুকেই মতবাদ বা তত্ত্ব বলা হয়ে থাকে।

ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদের উপর প্রভাবক শক্তিসমূহ

The forces that Influence Management Theory Approach

ব্যবস্থাপনা চিন্তাভাবনা বিভিন্ন শক্তি দ্বারা প্রভাবিত। প্রাচীন কাল হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত পরিবেশের চারটি প্রধান উপাদান দ্বারা ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব প্রভাবিত হয়ে আসছে। উপাদানগুলো হলো প্রযুক্তিগত (Technological), অর্থনৈতিক (Economical), সামাজিক (Social) এবং রাজনৈতিক (Political)। নিম্নে ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদের উপর এ সব উপাদানের প্রভাবের প্রকৃতি তুলে ধরা হলো:

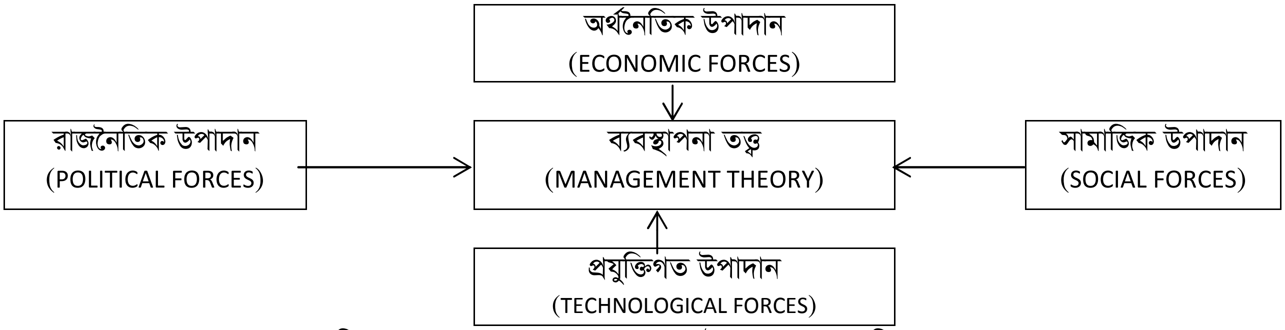

চিত্রঃ ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদের উপর প্রভাবক শক্তিসমূহ

১. প্রযুক্তিগত উপাদান (Technological Forces): আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, উৎপাদন, বন্টন, যোগাযোগ-সব কিছুই প্রযুক্তিনির্ভর। তথ্য-প্রযুক্তিকে যে যতটা গ্রহণ করতে পেরেছে, তার সাফল্যও তত মাত্রায় নিশ্চিত হয়েছে। Alvin Toffler প্রযুক্তিগত উপাদান সম্পর্কে বলেন, The knowledge, techniques and activities that lead to profound changes in products or processes are called technological forces. অর্থাৎ প্রযুক্তিগত উপাদান বলতে জ্ঞান, কলাকৌশল ও কর্মকাণ্ডকে বুঝায়, যা পণ্য বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যা আজকের ব্যবসায় এবং সরকারকে নানাভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির প্রভাব সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনীতির উপরও পড়েছে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করছে। পরিবেশ বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংগঠন কাঠামো প্রণয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব, প্রেষণা এবং নিয়ন্ত্রণসহ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি দ্বারা প্রভাবিত।

২. অর্থনৈতিক উপাদান (Economic Forces): আমরা জানি যে, সম্পদ সসীম, অভাব অসীম। সম্পদের সীমাবদ্ধতাই প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে এবং অনবরত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন বিভিন্ন সম্পদের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হয়েছে। তাই দেখা যায়, অর্থনীতি ও প্রযুক্তি পরস্পর সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক উপাদান সম্পর্কে প্রখ্যাত ব্যবস্থাপনা চিন্তাবিদ Wren বলেন, "Economic trends and the availabity of all types of resources (physical, human, financial and information resources) are called economic forces." অর্থাৎ, অর্থনৈতিক গতিধারা ও সবধরনের সম্পদের (শারীরিক, মানবীয়, আর্থিক এবং তথ্য সম্পদ) সহজলভ্যতাকেই প্রভাবক শক্তি বলে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক মন্দাভাব অথবা তেজিভাবের প্রভাব, অন্য দেশের অর্থনীতির উপর পড়বেই। ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন: পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংগঠন কাঠামো প্রণয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিশ্লেষণ, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির উপর অর্থনৈতিক উপাদানগুলো প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল। সম্পদের সহজলভ্যতা, অর্থনীতির গতিধারা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা না করে ব্যবস্থাপনার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

৩. সামাজিক উপাদান (Social Forces): সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, দায়-দায়িত্ব এবং সামাজিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে ব্যবস্থাপনা কোনোভাবেই সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে না। এ সম্পর্কে **Wren** বলেন, "The values, needs and norms that influence the behavior of people within a culture constitute social forces. অর্থাৎ একটি সংস্কৃতির মধ্যে মূল্যবোধ, প্রয়োজন ও রীতিনীতি যা মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে, তা নিয়েই সামাজিক প্রভাবক গঠিত। সুতরাং, সামাজিক পরিবেশ ও মানুষের জীবনযাত্রার ধরন, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, রীতিনীতি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে ব্যবস্থাপকদেরকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে।

৪. রাজনৈতিক উপাদান (Political Forces): রাজনৈতিক উপাদান দেশে প্রচলিত সরকারি নীতিমালা, কৌশল এবং আইনগত বিধি-বিধান দ্বারা গঠিত। সরকারি-বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের উপরই এ সব উপাদানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। একটি জাতির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা অন্য জাতি বা অন্য দেশ ব্যাপক মাত্রায় প্রভাবিত হয়। তাই দেখা যায়, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক উপাদানসমূহ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে। সাংগঠনিক পরিবেশ, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংগঠন কাঠামো প্রণয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন

রাজনৈতিক উপাদানের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাকে পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মতাদর্শকে সম্পূর্ণ বিবেচনায় রেখে নিজস্ব দর্শনের বিকাশ ঘটাতে হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, যুগে যুগে ব্যবস্থাপনার যে সকল তত্ত্ব বা মতবাদসমূহ উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলো কোনো না কোনোভাবে উল্লিখিত প্রভাবকসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানকে সফলভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত প্রভাবকসমূহ ব্যবস্থাপকদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপক এর সম্পর্ক, ব্যবস্থাপনার সাধারণ তত্ত্ব, ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ধারণা, ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদের উপর প্রভাবক শক্তিসমূহ সম্পর্কে খাতায় লিখবেন এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে দেখাবেন।

সারসংক্ষেপ

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। এ উদ্দেশ্যার্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানকে নানাবিধ কাজ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানে বস্তুগত (কাঁচামাল, মেশিনারিজ, দালানকোঠা, অন্যান্য সম্পদ) ও অবস্তুগত সম্পদ (মানব সম্পদ-কমচারী, কর্মকর্তা, শ্রমিকগণ) ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দেশ্যার্জনের জন্য যে সকল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় তা-ই ব্যবস্থাপনা। হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol) বলেছেন, "ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা করা, সংগঠিত করা, আদেশ-নির্দেশ দেওয়া, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা।" F. W. Taylor বলেছেন, "মানুষ কী করতে চায় তা প্রকৃত পক্ষে জানা এবং তা স্বল্প খরচে ও সর্বোত্তম উপায়ে সমাধান করার প্রক্রিয়াই হলো ব্যবস্থাপনা।সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল কাজ হয়, তা পরিচালনাকারী হলো ব্যবস্থাপক। আবার অন্যভাবে বলা যায়, যিনি প্রতিষ্ঠানের অন্য লোকদের কাজ সংগঠিত করেন, তিনিই ব্যবস্থাপক। তাহলে দেখা যায় যে, কাজকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার জন্য ব্যবস্থাপককে যে কাজগুলো করতে হয়, তা হলো-পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন, প্রেষণাদান, নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি।প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কাজ করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ব্যবস্থাপকগণ কি কাজ করেন যেমন: এফ.ডব্লিউ টেলর ও তাঁর অনুসারীরা মনে করেন যে, ব্যবস্থাপকগণ শুধু কারখানা পরিকল্পনা করেন। আবার, হেনরি ফেয়ল ব্যবস্থাপকের কাজকে জটিল প্রশাসনিক কাজ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকে ব্যবস্থাপনাকে একজন পরিচালক বা প্রশাসন বা মানব সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। চিন্তা হলো জ্ঞানের যে-কোনো শাখার নির্ভরযোগ্য ধারণা। জ্ঞান বিভিন্ন পন্থায় সর্বদা উন্নত হয় এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। যে-কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জ্ঞান বিভিন্ন উৎস হতে উৎসারিত হয় এবং প্রতিটি উৎসেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। এ প্রতিটি উৎসের ধারাকেই চিন্তাধারা, অ্যাপ্রোচ বা মডেল বা স্কুল বলে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বা স্কুল বা মডেল বা অ্যাপ্রোচ হলো ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বতন্ত্র ধারা। ব্যবস্থাপনা চিন্তা-চেতনা বিভিন্ন শক্তি দ্বারা প্রভাবিত। প্রাচীনকাল হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত পরিবেশের চারটি প্রধান উপাদান দ্বারা ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব প্রভাবিত হয়ে আসছে। উপাদানগুলো হলো প্রযুক্তিগত (Technological), অর্থনৈতিক (Economical), সামাজিক (Social) এবং রাজনৈতিক (Political)।

পাঠ-১.৩ ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য, ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা উন্নয়নের ইতিহাস

Objective of Studying Management Thought, History of the Development of Management Thought

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা উন্নয়নের ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য

Objective of Studying Management Thought

সৃষ্টির আদিকাল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ বা বর্তমান সময় পর্যন্ত বহু ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, সে সম্পর্কে ব্যবস্থাপনার একজন ছাত্র হিসাবে জানা অত্যন্ত জরুরি। কালাতিক্রমে ব্যবস্থাপনার মতবাদ বা দর্শন এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সে সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। ব্যবস্থাপনার দর্শন, তত্ত্ব, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, কৌশল ইত্যাদির যে গুণগত ও প্রায়োগিক উন্নয়ন ঘটেছে তা ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি প্রয়োগের সাথে যারা জড়িত বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ের সাথে যাদের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল, তাদের ব্যবস্থাপনার বিবর্তন সম্পর্কে কমবেশি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. **ব্যবস্থাপনার বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন:** ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়। মানব সভ্যতার শুরুতেই ব্যবস্থাপনার যে প্রয়োগ পদ্ধতি ছিল, আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ পদ্ধতি অনেকাংশেই পরিবর্তিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে আমরা ব্যবস্থাপনার বিবর্তন সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান লাভ করতে পারি।

২. **ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যা সনাক্তকরণ:** মানব সভ্যতার শুরুতেই ব্যবস্থাপনার প্রায়োগিক ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা ছিল এবং বর্তমানেও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে আমরা ব্যবস্থাপনার তত্ত্বীয় এবং প্রায়োগিক সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারি।

৩. **প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান:** ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার পদ্ধতিগত সমাধানের অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত সমস্যাগুলো সমাধানের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির প্রায়োগিক দিকগুলো সম্পর্কে জানা যায়। সুতরাং ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে যাবতীয় বাধা দূর করার নিমিত্তে বাস্তবমুখী কৌশলগত দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

৪. **ব্যবস্থাপনার মৌলিক দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন:** ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সফলভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন প্রকার মতবাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার মৌলিক দর্শন বা মতবাদ সম্পর্কে আমরা গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারি। এই ভাবে আমরা ব্যবস্থাপনার মৌলিক দর্শন বা মতবাদগুলোর সফল প্রায়োগিক অভিজ্ঞতাও লাভ করতে পারি।

৫. **ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কার্যকারিতা উন্নয়ন:** ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যায়। কারণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। অতএব ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগের জন্য ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

৬. **ব্যবস্থাপনার প্রায়োগিক দিকের উন্নয়ন:** ব্যবস্থাপনার দর্শন বা মতবাদ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভের অন্যতম কারণ হলো ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। ব্যবস্থাপনা

চিন্তাধারা অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারি। ফলে নিজ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তা কাজে লাগাতে পারি।

৭. **ব্যবস্থাপনার গবেষণা ও উন্নয়নের ভিত্তিঃ** মানব সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, আদর্শ, মূলনীতি ও কার্যসম্পাদনের কৌশল সম্পর্কে বিভিন্ন গুণ ও পরিমাণগত গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত কৌশল উন্নয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে জানা যায়।

ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো যে, কোনো প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে উদ্দেশ্যার্জন করা। এই জন্য প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট সমস্যার সঠিক সমাধান করা এবং দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনের মাধ্যমে দক্ষভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে। তা না হলে বর্তমানে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা উন্নয়নের ইতিহাস

History of the Development of Management Thought

আলোচনার সুবিধার্থে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়; যেমনঃ ১। ব্যবস্থাপনার সাধারণ জ্ঞানের যুগ (১০,০০০ খ্রি. পূ. থেকে ১৫০০ খ্রি.) ২। এক যুগ থেকে অন্য যুগে পরিবর্তনের সময়কার ব্যবস্থাপনা (১৫০১ খ্রি. থেকে ১৮৯৯ খ্রি. পর্যন্ত) ৩। ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির যুগ (১৯০০ খ্রি. থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত)।

১। **ব্যবস্থাপনার সাধারণ জ্ঞানের যুগ (Era of Common sense in Management)ঃ** আমরা জানি যে বিশ শতকে ব্যবস্থাপনার সত্যিকার উন্নয়ন সাধিত হয়। কিন্তু এ শতকের পূর্বে ব্যবস্থাপনার দীর্ঘ-ইতিহাস রয়েছে। মানুষ পারিবারিকভাবে বসবাসের পূর্বেই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তবে তুষারযুগে (glacial age) ব্যবস্থাপনা চিহ্নিত হয় (১০,০০০ থেকে ৯,০০০ খ্রি. পূর্ব)। এ সময় মানুষ দলগতভাবে খাদ্য, পশু, মাছ ইত্যাদি সংগ্রহ করতো। পশু, মাছ ইত্যাদি শিকার করে এবং জাম, বাদাম ইত্যাদি সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতো। এটিকে Mesolithic culture বলে। কৃষি কাজ দিয়ে এ সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময় অধিক হারে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কৃষির আবিষ্কারের ফলে মানুষ এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করে খাদ্য সংগ্রহ করা বন্ধ করে দেয় এবং তারা একত্রে একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের সৃষ্টি করে। এইভাবে একত্র লোকদেরকে পরিচালনা (Manage) করার জন্য কিছু পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় এবং এ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এক শ্রেণির চতুর, ধূর্ত, বুদ্ধিমান লোকের দল সৃষ্টি হয় যাদেরকে ব্যবস্থাপক (Manager) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তাদের মধ্যে কেউ ধর্মযাজক, রাজা বনে যায় এবং কেউ কেউ মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। তাঁরা সমাজের ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী হয়।

এক্ষেত্রে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সুমেরিয়, মিশরীয়, গ্রিক, চৈনিক, রোমান ও ভারতীয় সভ্যতাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ব্যবস্থাপনার সাধারণ জ্ঞানের যুগকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ
(ক) প্রাচীন সভ্যতার ব্যবস্থাপনা (Management in ancient civilization) ও
(খ) মধ্যযুগে ব্যবস্থাপনা (Management in medieval period)

(ক) প্রাচীন সভ্যতার ব্যবস্থাপনা (Management in ancient civilization)ঃ খ্রি. পূর্ব ১০,০০০ থেকে ৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দ এর মধ্যবর্তী সময়কে প্রাচীন সভ্যতা হিসাবে গণ্য করা হয়। এ সময় ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

১. **মেসোপটেমিয় সভ্যতা (Masopotemian Civilization)ঃ** ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়ে ওঠা সভ্যতাই মেসোপটেমিয় সভ্যতা হিসাবে খ্যাত। এখানকার ধর্মযাজক ও পুরোহিতগণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করতে গিয়ে যে কাজগুলো অনুসরণ করতেন, তা-ই পরবর্তীকালে ব্যবস্থাপনার কাজ বলে গণ্য হতো।

২. **মিশরীয় সভ্যতা (Egyptian Civilization)ঃ** মিশরীয় সভ্যতার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। প্রাচীনকাল হতে নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলে মিশরীয় সভ্যতার বিস্তার ঘটে। ব্যবসায়-বাণিজ্য, সমরকার্যে, নির্মাণশৈলী প্রভৃতি বিষয়ে পরিকল্পনা,

সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়, বিশেষীকরণ, মজুরিপ্রথা এরূপ নানা ধরনের ব্যবস্থাপনা কাজ মিশরীয় সভ্যতার অবদান। মিশরের বিখ্যাত পিরামিড নির্মাণ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৩. **চীনা সভ্যতা (Chinees Civilization)ঃ** ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল উদ্ভাবনে চীনা সভ্যতার অবদানও কম নয়। সমর কৌশল (The art of war) সম্পর্কে লিখিত সানজু (Sun zu) এর বিখ্যাত গ্রন্থে এর সত্যতা মেলে। এ ছাড়া মেনাসিয়াম, চৌ, লাওজোঁ, সুকন প্রমুখ ব্যক্তিগণ অর্থ পরিচালনা, রাজ্য পরিচালনা, ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন।

৪. **ব্যবিলনীয় সভ্যতা (Babilonian Civilization)ঃ** এ সময় ব্যাবিলনীয় রাজা হাম্মুরা শৃঙ্খলভাবে রাজ্য পরিচালনার জন্য বিশেষ বিধান (The code of Hummurabi) চালু করেন। এছাড়া এখানকার আর এক রাজা নেবুচাঁদনেজার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও প্রণোদনামূলক মজুরি প্রথা চালু করেন।

৫. **রোমক সভ্যতা (Roman Civilization)ঃ** প্রাচীনকালে রোমক সভ্যতার খ্যাতিও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকেই রোম ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতির সূতিগার ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দে প্রতিষ্ঠিত রোমক ঋণদানকারী ব্যাংক ব্যবসার প্রচলন বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

৬. **গ্রিক সভ্যতা (Greek Civilization)ঃ** আধুনিক ব্যবস্থাপনার চারণভূমি হিসাবে খ্যাত গ্রিসে মহামতি সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, জ্যোনোফোনসহ প্রখ্যাত মনীষীদের জন্ম হয়। যারা তাদের লেখনীতে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। সক্রেটিসই প্রথম বলেছিলেন "ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন" (Management is universal)।

৭. **সিন্ধু সভ্যতা (Indus Civilization)ঃ** ব্যবস্থাপনার বহু কলাকৌশল সিন্ধু সভ্যতার অবদান। খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ সালে ভারতীয় পণ্ডিত কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্রতে অর্থ ব্যবস্থাপনা, রাজ্য পরিচালনা, কৃষিকাজ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

(খ) মধ্য যুগে ব্যবস্থাপনা (Management in medieval period)ঃ খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭৬ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ হিসাবে গণ্য করা হয়। ইতিহাসে এ সময়টি অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় বলে ধরা হয়। এ সময় সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল। তবে অত্র সময়ে ব্যবস্থাপনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় একটা শিক্ষা এ সময়ে পাওয়া যায়, তা হলো স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের (Local autonomy) মধ্যে সমতা বিধান করা। এ সময়কার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের লেখনি হতে ব্যবস্থাপনার বহু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। ৯০০ খ্রিষ্টাব্দে আলফারাবি (Alfarabi) পরামর্শমূলক নির্দেশনার Consultative Direction এর কথা বলেন এবং এর ২০০ বছর পর ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে ইমাম গাজ্জালি চারটি গুণাবলি উল্লেখ করেন, যা একজন শাসকের জন্য খুবই প্রয়োজন। যেমনঃ (i) বিচার (Justice) (ii) বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) (iii) ধৈর্য্য (Patience) এবং (iv) দয়া (Modesty)। এগুলো এখানে একজন ভালো ব্যবস্থাপকের গুণাবলি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়াও আরও অনেক বিশেষজ্ঞ এ সময় অবদান রাখেন। তাদের মধ্যে রয়েছেনঃ লুকা প্যাসিওলি, থমাস মুর, নিকোলো ম্যাকিয়েভেলি, রিচার্ড আর্করাইট, ফ্রাসিসকো ডি মার্কো প্রমুখ।

২। এক যুগ থেকে অন্য যুগে পরিবর্তনের সময়কার ব্যবস্থাপনা (Management During the period of transition)ঃ ব্যবস্থাপনার ইতিহাস মোটামুটি ১২০০০ (বার হাজার) বছরের পুরনো। তবে শত শত বছরেও ব্যবস্থাপনা একটি স্বতন্ত্র শৃঙ্খলা বা ধারণা (Discipline) হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। প্রথমদিকে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন খুবই ধীরগতি সম্পন্ন ছিল। কিন্তু বিশ শতকে এর উন্নয়ন ছিল ব্যাপক। আলোচনার সুবিধার্থে সম্পূর্ণ সময়টাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমনঃ

১। ব্যবস্থাপনায় সাধারণ জ্ঞানের যুগ (১০,০০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ)
২। যুগ পরিবর্তনের সময় (১৫০১ খ্রি. থেকে ১৮৯৯ খ্রি.) এবং
৩। ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির যুগ (১৯০০ খ্রি. থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত)

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার যুগ ও খ্রিষ্টাব্দ ১০,০০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যকার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির তেমন

উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। এই সময়টি যুগ পরিবর্তনের সময় হিসাবে পরিগণিত হয়। এ সময়টিকে কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনা করা হলো:

(ক) মধ্যযুগের ঠিক পরবর্তী বছর এবং শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তী সময় ১৫০১-১৭৬০ (Management during immediae past medieval period and pre-industrial revoluution 1501-1760): এ যুগের প্রথমদিকে উৎপাদনের ঘরোয়া পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ, তখন পারিবারিকভাবে পরিবারের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করা হতো। যদিও-বা কিছু অতিরিক্ত থাকতো, তা বিক্রি করে বা বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যান্য দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করা হতো। এ অবস্থায়, ব্যবস্থাপনার কৌশল উন্নয়নের তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। তবে এ যুগের পরবর্তী অংশে অর্থাৎ শেষের দিকে উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য মানুষ গ্রাম-গঞ্জে দালাল (Broker) হিসাবে কাজ করত। এ সময়ে মজুত পণ্য ব্যবস্থাপনা এর (Materials Management) উপর জোর দেওয়া হয়। যদিও এ সময়ে ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। তথাপি এ সময়ের কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকদের লেখনি থেকে অনেক কিছু জানা যায়। এদের মধ্যে ইংল্যান্ডের Sir Thomas moore উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Utopia’ তে ব্যবস্থাপনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক-নির্দেশনা দেন, যেমন: বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা (Economies of mass production) ও বিশেষীকরণের সুবিধা (advantage of specialization) ইত্যাদি। এ সময়ের আর-এক বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব হলেন ইটালির Nicolo Machiavelli যিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। (i)“The Prince” (ii)“The Discourses” এ দুটি বইয়েই ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন। তাঁর দেখা রাষ্ট্রের জন্য চারটি নীতি আজও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব বহন করছে, তা হলো:

(i) আধিক্যের মতামতের উপর বিশ্বাস (Reliance on mass consent)
(ii) একতা (Cohesiveness)
(iii) নেতৃত্ব (Leadership) ও
(iv) টিকে থাকার ইচ্ছা (Will to Survive)

(খ) শিল্পবিপ্লবের সময়ের ব্যবস্থাপনা ১৭৬০-১৮৪০ (Management during Industrial Revolution 1760-1840): মানব সভ্যতার ইতিহাসে শিল্পবিপ্লব হলো একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটি মানব জীবনে গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছে। এটি ব্যবস্থাপনার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে যে সময়ে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে সে সময় ব্যবস্থাপনার জন্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এ সময়ে কিছু পন্ডিত ব্যক্তিদের অবদান বা কাজ প্রকাশিত হয়েছে যা ব্যবস্থাপনার প্রাচীন চিন্তাধারার সাথে আধুনিক চিন্তাধারার যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এ সময়ে এমন কিছু বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যারা মূলত ব্যবস্থাপনার বিশেষজ্ঞ নয়, কিন্তু ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আর তাঁরা হলেন: Sir James Steuwart, Adam Smith, Richard Arkwright, James Watt, James Mill, Robinson Boulton, Robert Owen, ও Charles Babbage প্রমুখ। ১৭৬৭ সালে James Steuwart তাঁর বিখ্যাত বই “An Inquiry into the Principles of Political Economy.” বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তিনি রাষ্ট্রনায়কের জন্য যে নীতির কথা উল্লেখ করেন, তা একজন ব্যবস্থাপকের জন্য অবশ্য পালনীয়। তিনি তাঁর পুস্তকে কর্তৃত্বের উৎস, ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকের মধ্যে কাজের সমবিভাজন, “বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা” এবং প্রণোদনামূলক মজুরি কর্মসূচি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। James Steuwart মনে করেন, “সকল কর্তৃত্ব নির্ভরশীলতার আনুপাতিক হয়ে থাকে এবং পরিস্থিতি বুঝে অবশ্যই ভিন্নতর হবে।” (All authority is in proportion to the dependency and must vary according to circumstances.) ১৭৭৬ সালে স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ Adam Smith এর বিখ্যাত গ্রন্থ The Wealth of Nations এ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে, বিশেষ করে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা’র ক্ষেত্রে। ইংরেজ শিল্পপতি Richard Arkwright উৎপাদন ও কর্মী ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে অবদান রাখেন। তাঁর অবদানের ক্ষেত্র হলো- অবিরত উৎপাদন, যন্ত্রপাতি স্থাপন পরিকল্পনা, কারখানা শৃঙ্খলা, শ্রমবিভাজন, যন্ত্রপাতির সমন্বয়, মজুত পণ্য, অর্থ ও মূলধন প্রভৃতি। এগুলো তাকে ব্যবস্থাপনার নীতি প্রয়োগের অগ্রদূত হিসাবে খ্যাত করে রেখেছে। Mr. James watt, Robinson Boultton ব্যবস্থাপনার কতিপয় ক্ষেত্রে চমৎকার অবদান রাখেন। ক্ষেত্রগুলো হলো: মার্কেটিং গবেষণা, উৎপাদন পরিকল্পনা, মান নিয়ন্ত্রণ, কর্মীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। Robert Owen যিনি কর্মী ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ হয়ে আছেন, তিনি

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে স্কটল্যান্ডের বস্ত্র কারখানায় গবেষণা শুরু করেন যা ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়। তিনি লক্ষ্য করেন যে, উন্নত কার্য পরিবেশ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উৎপাদনশীলতার ব্যাপক উন্নয়নসাধন করে।

(গ) শিল্পবিপ্লবের ঠিক পরবর্তী সময় এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্ভবের ঠিক পূর্ববর্তী সময়ের ব্যবস্থাপনা ১৮৪১-১৮৯৯(Management during immediate past Industrial Revolution and immediate before the Emergence of Scientific Management 1841-1899): শিল্পবিপ্লব সম্পূর্ণ উৎপাদন পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। তখন প্রচুর শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এ সময় বিশেষীকরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন জরুরি হয়ে পড়ে ও বাস্তব রূপ লাভ করে এবং এইভাবে তখন বৃহদাকার উৎপাদন সম্ভব হয়। তবে এ সকল কার্যক্রম ব্যবস্থাপনাকে জটিল করে তোলে এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় এ সকল ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আরো, সঠিক, ব্যাপক ও দক্ষ পদ্ধতির জন্য পৃথিবীকে "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা" (Scientific Management) আসা পর্যন্ত (১৯০০ খ্রি.) অপেক্ষা করতে হয় ১৮৪১ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত সময়টা ছিল বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তিত্ব ও পেশাদারদের নানামুখী কার্যের সমাহারযুক্ত রঙিন সময়; তাদের মধ্যে রয়েছেন Henry Poor, Daniel C, McCollum, Willaim S. Jevons, Joseph Wharton, Henr Metcalfe, Henry R. Towne, Frderic Halsey ও অন্যান্যরা।

Henry Poor বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সম্পর্কে লেখেন। Willaim S. Jevon ১৮৭১ সালে গতি নিরীক্ষা (Motion Study) ও শ্রান্তি নিরীক্ষা (Fatigue Study) করেন এবং লেখা প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ সালে Henry R. Towne 'Science of Management' পুস্তক প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি আধুনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন, Towne হলেন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অগ্রদূত। তিনি ঐ বছরই "The Engineer as an Economist" নামে যে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন, সেটি F. W. Taylor কে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল।

৩। **পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনার যুগ ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত (Era of Systematic Management 1900-till the Date):** মানব জাতির ইতিহাসে শিল্পবিপ্লব হলো একটি স্মরণীয় ঘটনা। এটি উৎপাদনের পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করে। এ সময় ঘরে ঘরে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেড়ে যায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয় এবং বাড়তে থাকে। তখন এ ক্ষেত্রে বিশেষীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এসবই ব্যাপক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে এতে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ ব্যাপক উৎপাদনের পর্যায়ে চলমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ধারণার সৃষ্টি হয় যে, ব্যবস্থাপনা অবশ্যই পদ্ধতিসম্পন্ন হতে হবে এবং কাজ হতে হবে আনুষ্ঠানিক ও সংগঠিত। এ সময়ে অর্থাৎ, ১৯০০ শতকে F. W. Taylor তার সমুন্নত ও সুসজ্জিত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে আবির্ভূত হন, যা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। এভাবে পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনার যাত্রা শুরু হয়। এউপর বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসাধনের চেষ্টা চালিয়েছেন। হেনরি ফেয়লের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পর্ক আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারীগণ হলেন- হুগো মনস্টার বার্গ, চেস্টার আই বার্নার্ড, এলটন মেপয়া, মেরি পার্কার ফলেট প্রমুখ। যাহোক, বহু চড়াই উৎড়াই পাড়ি দিয়ে বর্তমানে ব্যবস্থাপনা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা উন্নয়নের ইতিহাস সম্পর্কে ভালোমতো অধ্যয়নপূর্বক এ্যাসাইনমেন্ট লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

সৃষ্টির আদি কাল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ বা বর্তমান সময় পর্যন্ত বহু ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, সে সম্পর্কে একজন ব্যবস্থাপনার ছাত্র হিসাবে জানা অত্যন্ত জরুরি। কালাতিক্রমে ব্যবস্থাপনার মতবাদ বা দর্শন এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সে সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। ব্যবস্থাপনার দর্শন, তত্ত্ব, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, কৌশল ইত্যাদির যে গুণগত ও প্রায়োগিক উন্নয়ন ঘটেছে তা ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি প্রয়োগের সাথে যারা জড়িত বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ের সাথে যাদের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল, তাদের ব্যবস্থাপনার বিবর্তন সম্পর্কে কম-বেশি জ্ঞান থাকা আবশ্যক।আমরা জানি যে বিশ শতকে ব্যবস্থাপনার সত্যিকার উন্নয়ন সাধিত হয়। কিন্তু এ শতকের পূর্বে ব্যবস্থাপনার দীর্ঘ-ইতিহাস রয়েছে। মানুষ পারিবারিকভাবে বসবাসের পূর্বেই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তবে তুষার যুগে (glacial age) ব্যবস্থাপনা চিহ্নিত হয় (১০,০০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ৯,০০০ খ্রিষ্টপূর্ব)। এ সময় মানুষ দলগতভাবে খাদ্য, পশু, মাছ ইত্যাদি সংগ্রহ করতো। পশু, মাছ ইত্যাদি শিকার করে এবং জাম, বাদাম ইত্যাদি সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতো। এটিকে Mesolithic culture বলে। কৃষি কাজ দিয়ে এ সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময় অধিক হারে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কৃষির আবিষ্কারের ফলে মানুষ এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে খাদ্য সংগ্রহ করা বন্ধ করে দেয় এবং তারা একত্রে একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের সৃষ্টি করে। এভাবে একত্র লোকদেরকে পরিচালনা (Manage) করার জন্য কিছু পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় এবং এ পদ্ধতির মধ্যদিয়ে এক শ্রেণির চতুর, ধূর্ত, বুদ্ধিমান লোকের দল সৃষ্টি হয় যাদেরকে ব্যবস্থাপক (Manager) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তাদের মধ্যে কেউ ধর্মযাজক, রাজা বনে যায় এবং কেউ কেউ মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। তাঁরা সমাজের ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী হয়। এক্ষেত্রে আর-একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সুমেরিয়, মিশরীয়, গ্রিক, চৈনিক, রোমক ও ভারতীয় সভ্যতাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭৬ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ হিসাবে গণ্য করা হয়। ইতিহাসে এ সময়টি অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় বলে ধরা হয়। এ সময় সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল। তবে অত্র সময়ে ব্যবস্থাপনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় একটা শিক্ষা এ সময়ে পাওয়া যায়, তা হলো স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের (Local autonomy) মধ্যে সমতা বিধান করা। এ সময়কার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের লেখনী হতে ব্যবস্থাপনার বহু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ তে আলফারাবি (Alfarabi) পরামর্শমূলক নির্দেশনার (Consultative Direction) এর কথা বলেন এবং এর ২০০ বছর পর ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে ইমাম গাজ্জালি চারটি গুণাবলি উল্লেখ করেন, যা একজন শাসকের জন্য খুবই প্রয়োজন। যেমন: (i) বিচার (Justice) (ii) বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) (iii) ধৈর্য্য (Patience) এবং (iv) দয়া (Modesty)। এগুলো এখানে একজন ভালো ব্যবস্থাপকের গুণাবলি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়াও আরও অনেক বিশেষজ্ঞ এ সময় অবদান রাখেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন: লুকা প্যাসিওলি, থমাস সুর, নিকোলো ম্যাকিয়েভেলি, রিচার্ড আর্কবাইট, ফ্রাসিসকো ডি মার্কো প্রমুখ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে শিল্পবিপ্লব হলো একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটি মানব জীবনে গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছে। এটি ব্যবস্থাপনার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে যে সময়ে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। সে সময়ে ব্যবস্থাপনার জন্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এ সময়ে কিছু পন্ডিত ব্যক্তিদের অবদান বা কাজ প্রকাশিত হয়েছে যা ব্যবস্থাপনার প্রাচীন চিন্তাধারার সাথে আধুনিক চিন্তাধারার যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এ সময়ে এমন কিছু বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যারা মূলত: ব্যবস্থাপনার বিশেষজ্ঞ নয়, কিন্তু ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আর তাঁরা হলেন- Sir – James Steuwart, Adam Smith, Richard Arkwright, James Watt, James Mill, Robinson Boulton, Robert Owen, Charles Babbage প্রমুখ। ১৭৬৭ সালে James Steuwart তাঁর বিখ্যাত বই "An Inquiry into the Principles of Political Economy." বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তিনি রাষ্ট্রনায়কের জন্য যে নীতির কথা উল্লেখ করেন, তা একজন ব্যবস্থাপকের জন্য অবশ্য পালনীয়। তিনি তার পুস্তকে কর্তৃত্বের উৎস, ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকের মধ্যে কাজের সমবিভাজন, "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা" এবং প্রণোদনামূলক মজুরি কর্মসূচি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

পাঠ-১.৪ ব্যবস্থাপনা স্কুল/মতবাদ/মডেল/অ্যাপ্রোচ
Management School/Thought/Model/Appoaches

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্কুল/মতবাদ/মডেল/অ্যাপ্রোচ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা স্কুল/মতবাদ/মডেল/অ্যাপ্রোচ
Management School/Thought/Model/Appoaches
অথবা, ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণের ধরন
Paterns of Management Analysis

চিন্তা হলো জ্ঞানের যে-কোনো শাখার নির্ভরযোগ্য ধারণা। জ্ঞান বিভিন্ন পন্থায় সর্বদা উন্নত হয় এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। যে-কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জ্ঞান বিভিন্ন উৎস হতে উৎসারিত হয় এবং প্রতিটি উৎসেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। এ প্রতিটি উৎসের ধারাকেই চিন্তাধারা, স্কুল, মডেল বা অ্যাপ্রোচ বলে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বা স্কুল বা মডেল বা অ্যাপ্রোচ হলো ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বতন্ত্র ধারা। নীচে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্রোচ, মডেল বা স্কুল সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

ব্যবস্থাপনা স্কুল বা মতবাদ বা মডেল
Management Schools or Appoaches or Models

লেখক (Author)	অ্যাপ্রোচ/স্কুল/মডেল
১। হ্যারল্ড কুঞ্জ এবং সিরিল ও ডুনেল (Harold Koontz & Cyrill O. Donnel)	১। কার্যসংক্রান্ত অ্যাপ্রোচ (The operational or functional approach) ২। প্রায়োগিক অ্যাপ্রোচ (The empirical approach) ৩। মানব আচরণ অ্যাপ্রোচ (The human behavior approach) ৪। সামাজিক সিস্টেম অ্যাপ্রোচ (The social system approach) ৫। সিদ্ধান্ত তত্ত্ব অ্যাপ্রোচ (The decision theory approach) ৬। যোগাযোগ কেন্দ্র অ্যাপ্রোচ (The communication center approach) ৭। গাণিতিক অ্যাপ্রোচ (The mathematical approach)
২। হেইনস, ডব্লিউ ওয়ারেন ও জোসেফ এল মেসাই (Haynes, W. Warren and Joseph L. Massie)	১। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management) ২। ব্যবস্থাপনা নীতি (Principles of Management) ৩। মানব সম্পর্ক বা মানব আচরণ (Human relation or Human behavior) ৪। সংখ্যাত্মক বা গাণিতিক (Quantitative/Mathmetical) ৫। হিসাব বিজ্ঞান (Accounting or Economics concept)
৩। আর্নেস্ট ডেল (Earnestt Dale)	১।ব্যবস্থাপনা স্কুলের নীতি (Principles of Management School) ২। আচরণ স্কুল (Behavior School) ৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্কুল(Decision making School) ৪। গাণিতিক স্কুল (Mathematical School) ৫।পদ্ধতি বিশ্লেষণ স্কুল (System Analysis School) ৬। বায়োলজিক্যাল স্কুল (Biological School)
৪। কেলি জয় (Kelly Joe)	১।ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব (Classical Theory) (ক) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management) (খ) প্রশাসনিক তত্ত্ব (Administrative Theory) (গ) আমলাতান্ত্রিক তত্ত্ব (Bureaucratic Theory) ২। মানব সম্পর্ক (Human Relations)

লেখক (Author)	অ্যাপ্রোচ/স্কুল/মডেল
	৩। পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনা (System Management) ৪। পরিস্থিতি অ্যাপ্রোচ (Contingency Approach)
৫। হিকস, এইচ, জি ও গুলিত, সি, আর (Hicks, H, G. and Gullic C.R)	১। ধ্রুপদী তত্ত্ব (Classical Theory) (ক) আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) (খ) প্রশাসনিক তত্ত্ব (Administrative Theory) (গ) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management) ২। নব্য ধ্রুপদী তত্ত্ব / মানব সম্পর্ক আন্দোলন (Neo-classical theory or the Human Relations Movement) ৩। আধুনিক তত্ত্ব (Modern Theory) (ক) পদ্ধতি বিশ্লেষণ তত্ত্ব (Sysems Analysis) (খ) পরিস্থিতি অ্যাপ্রোচ (Contingency Approach)

উপর্যুক্ত তালিকা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবস্থাপনায় কোনো তত্ত্বই এককভাবে গৃহীত হয়নি। তাই ব্যবস্থাপনা হলো জঙ্গল তত্ত্ব। তবে উপর্যুক্ত তালিকা পর্যালোচনাপূর্বক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা স্কুলসমূহের একটি ব্যাপক, সহজ কিন্তু ধারাবাহিক তালিকা প্রণয়ন করা যায়। নীচে তা দেখানো হলো:

মডেল/স্কুল/অ্যাপ্রোচসমূহের নাম	মডেল/ স্কুল/অ্যাপ্রোচ
১। ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল স্কুল (Classical School)	(ক) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management) (খ) আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) (গ) প্রক্রিয়া বা কার্যসংক্রান্ত /প্রশাসনিক অ্যাপ্রোচ (Process or Functional or Administrative Approach)
২। নব্য ধ্রুপদী স্কুল (Neo-classical School)	(ক) মানব সম্পর্ক অরিয়েন্টেশন (Human Relations Orientation) (খ) মানবসম্পদ অরিয়েন্টেশন (Human Resources Orientation) (গ) মানব সীমাবদ্ধতা অরিয়েন্টেশন (Human Limitations Orientation)
৩। আধুনিক স্কুল (Modern School)	(ক) পরিমাণগত মতবাদ (Quantitative Approach) (খ) সিস্টেম মতবাদ (System Approach) (গ) কনটিনজেন্সি বা পরিস্থিতি মতবাদ (Contingency or situational Approach)

নীচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১। ধ্রুপদী বা প্রাচীন মতবাদ (Classical School): ব্যবস্থাপনায় প্রাচীন মতবাদ কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে: সংগঠনের আনুষ্ঠানিক ও স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় কাঠামো, ব্যবস্থাপনা স্থায়ী ধরনের কাজ এবং মানুষ সম্পর্কে অনৈতিক ধারণা। ধ্রুপদী বা প্রাচীন মতবাদের তিনটি উপাদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

(ক) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management): শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ সময় কিছু পণ্ডিত, পেশাজীবী, ব্যবস্থাপক শিল্পপতি প্রমুখ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করেন এবং অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন Henry Poor, Henry R. Towne, Henry Metcalfe, Frederic Halsey, Herrington Emerson, Henry L. Gantt, Frank B. Lillian, M. Gilbreth Frederic Winslow Taylor প্রমুখ। তারা সকলে একসাথে ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করেন। তাঁরা ব্যবস্থাপনার সর্বক্ষেত্রকেই সমৃদ্ধ করেন। তবে তাঁদের অবদান মূল্যায়নপূর্বক সকলেই একমত হবেন যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হলো প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলি পরীক্ষানিরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি প্রয়োগ করার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সঠিকভাবে কাজ করার জন্য কতকগুলো উপাদানের প্রয়োজন, তা হলো সময় নিরীক্ষা (Time Study), গতি নিরীক্ষা (Motion Study), শ্রান্তি নিরীক্ষা (Fatigue study), উৎপাদন পরিকল্পনা (Production Planning), উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Production Control), যন্ত্রপাতি বিন্যাস (Plant layout), উৎসাহক পারিশ্রমিক মজুরি (Wage incentive) প্রভৃতি।

বাস্তবে বহু লোকের পরিশ্রমের ফসল হলো বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, কিন্তু F. W. Taylor কেই এ ব্যবস্থাপনার পুরোধা হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে তিনি Henry R. Towne দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। Taylor নিজেই বলেছেন যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হলো শত জ্ঞানের কাজের অবদান। তথাপি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ ও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ও রূপায়নে টেলরই প্রথম।

F. W. Taylor ১৮৭৮ সালে মিডভ্যাল স্টিল কোম্পানিতে প্যাটার্ন মেকার (Pattern Maker) হিসাবে যোগ দেন এবং ১৮৮৪ সালে ঐ কোম্পানির প্রধান প্রকৌশলী (Chief Engineer) হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। অত:পর তিনি বেথেল হেম স্টিল কোম্পানিতে যোগদান করেন। দুই দশক পর্যন্ত তিনি অনেক গবেষণা করেন। তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র (Article) হলো ‘A Piece rate system’ প্রকাশিত হয় ১৯০০ শতকে। এতে তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ তুলে ধরেন। তাঁর নীতির মধ্যে রয়েছে:

(i) শ্রমিকগণকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্বাচিত করতে হবে; প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে যে কাজের জন্য উপযোগী, সে কাজে নিয়োগ দেওয়া উচিত;
(ii) পুরাতন ধ্যানধারণা পাল্টে ফেলে বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থাৎ সংগঠিত জ্ঞানের প্রয়োগ করতে হবে;
(iii) কাজের পরিকল্পনাকারী ও কাজের বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে সু-সমন্বয় থাকতে হবে এবং
(iv) ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকগণকে কাজের জন্য সমভাবে দায়িত্ব বহন করতে হবে।

১৯০৩ সালে তিনি তার দ্বিতীয় গবেষণাপত্র “Shop Management” উপস্থাপন করেন। তার কাজের মূল তত্ত্ব হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের সহযোগিতায় সমাজের সকল ভালো কাজ করা সম্ভব। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাঁর দর্শন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় উল্লেখ করেছেন, তা হলো “বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ছিল ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে মানসিক বিপ্লব। তিনি পুনরল্লেখ করেন যে, যদি না উভয় পক্ষ হতে সম্পূর্ণরূপে মানসিক বিপ্লব হবে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব থাকবে না। যাহোক, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে সংগঠিত, কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত গবেষণা ও কাজ শুরু হয়।

(খ) আমলাতন্ত্র (Bureaucracy): আমলাতন্ত্রের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। এটি প্রাচীন চীন এবং রোমক সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমান কালে আমরা যে আমলাতন্ত্রের ধারণা সম্পর্কে অবগত আছি, তা বেশিদিনের পুরনো নয়। শিল্পবিপ্লবের পর যখন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়, তখনই আমলাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা যখন অপর্যাপ্ত এবং শ্রমিকদেরকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে মনে হতে লাগলো তখন আমলাতন্ত্রকে তত্ত্ব হিসাবে, প্রকাশ করার জন্য অনেকেই কাজ করতে লাগলো। এ বিষয়ে Richard Hall, Michael Crosier ও Robert Matron এর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে এটিকে প্রসিদ্ধ করে তোলে Max Weber এবং তিনিই এর জনক হিসাবে পরিগণিত। প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমলাতন্ত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন:
(i) পদের পর্যায়ক্রম (Hierachy);
(ii) পেশাগত মানের উপর গুরুত্বারোপ;
(iii) কর্মীদের নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও সঠিকতা;
(iv) সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিয়মকানুন ও প্রক্রিয়া অনুসরণ;
(v) কর্মীদের কর্তব্য ও দায়িত্বের সুস্পষ্টতা ইত্যাদি।

আমলাতন্ত্রের কতিপয় সুবিধা রয়েছে, যেমন:
(i) এটি বিশেষীকরণে বিশ্বাসী;
(ii) এটি স্থায়ী ও পূর্বানুমানযোগ্য;
(iii) এটি যৌক্তিক;
(iv) এটি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী;
(v)সর্বোপরি, এটি পক্ষপাতহীন।

তবে এর কতিপয় অসুবিধাও রয়েছে, যেমন:
(i) এটি অনমনীয় (Rigid);
(ii) এটি নৈর্ব্যক্তিক বা সম্পর্কহীন;
(iii) উদ্দেশ্যের কোনো নির্দিষ্টতা নাই;
(iv) সীমিত বিভাজন;
(v) অত্যন্ত ব্যয়বহুল;
(vi) অতিরিক্ত উদ্বিগ্নতা।
আমলাতন্ত্রের সুবিধা-অসুবিধা যাই হোক না কেন, আমলাতন্ত্রকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

(গ) প্রক্রিয়া বা কার্যসংক্রান্ত অ্যাপ্রোচ (Process or Functional Approach): মানুষের ধারণা ব্যবস্থাপনা হলো একটি সর্বজনীন বিষয় এবং সকল কাজের ক্ষেত্রেই এটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। তারা আরও মনে করে যে সব আকারের ও উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠানেই একই ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়।তবে কিছু লোক ব্যবস্থাপনা কাজের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে এবং তাঁরাই ব্যবস্থাপনাকে কার্যসংক্রান্ত অ্যাপ্রোচ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ফ্রান্সের শিল্পপতি Henri Fayol কে এ অ্যাপ্রোচের জনক বলে অভিহিত করা হয়। তবে James D. Mooney, Luther Gullick, Lyndall Urwick এর মত প্রখ্যাত ব্যক্তিদেরও এ স্কুল বা মতবাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। Henri Fayol কে এ মতবাদের জনক বলা হয় এ কারণে যে, তিনিই সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপনাকে প্রক্রিয়া হিসাবে স্বীকৃতি দেন এবং বলেন, কীভাবে এ প্রক্রিয়া কতিপয় নীতির আলোকে কার্যকর হবে।

Henri Fayol ১৯১৬ সালে ৭৫ বছর বয়সে নব্য ধ্রুপদী বই রচনা করেন। যার নাম “Administration Industriele et General যার ইংরেজি অনুবাদ হলো “General and Industrial Management” । ইংরেজিতে অনুবাদের পূর্বে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার লোকজন এটি সম্পর্কে জানতো না। ১৯৪৯ সালে এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। এতে H. Fayol ব্যবস্থাপনার নীতি ও কার্যক্রমকে জোরালোভাবে তুলে ধরেন।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্কুল বা মতবাদ সম্পর্কে এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধরনের স্কুল রয়েছে, এগুলো হলো: ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল স্কুল, নব্য ধ্রুপদী স্কুল ও আধুনিক স্কুল। **ধ্রুপদী বা প্রাচীন মতবাদ (Classical School):** ব্যবস্থাপনায় প্রাচীন মতবাদ কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে- সংগঠনের আনুষ্ঠানিক ও স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় কাঠামো, ব্যবস্থাপনার স্থায়ী ধরনের কাজ এবং মানুষ সম্পর্কে অনৈতিক ধারণা। ধ্রুপদী বা প্রাচীন মতবাদের তিনটি উপাদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

(ক) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management): শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ সময় কিছু পন্ডিত, পেশাজীবী, ব্যবস্থাপক শিল্পপতি প্রমুখ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করেন এবং অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন Henry Poor, Henry R. Towne, Henry Metcalfe, Frederic Halsey, Herrington Emerson, Henry L. Gantt, Frank B. Lillian, M. Gilbreth Frederic Winslow Taylor প্রমুখ। তারা সকলে একসাথে ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করেন। তারা ব্যবস্থাপনার, সর্বক্ষেত্রকেই সমৃদ্ধ করেন। তবে তাঁদের অবদান মূল্যায়নপূর্বক সকলেই একমত হবেন যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হলো প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি প্রয়োগ করার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সঠিকভাবে কাজ করার জন্য কতকগুলো উপাদানের প্রয়োজন, তাহলো সময় নিরীক্ষা (Time Study), গতি নিরীক্ষা (Motion Study), শ্রান্তি নিরীক্ষা (Fatigue study), উৎপাদন পরিকল্পনা (Production Planning), উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Production Control), যন্ত্রপাতি বিন্যাস (Plant layout), উৎসাহক পারিশ্রমিক (Wage incentive) প্রভৃতি। **(খ) আমলাতন্ত্র (Bureaucracy):** আমলাতন্ত্রের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। এটি প্রাচীন চীন এবং রোমক সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমানকালে আমরা যে আমলাতন্ত্রের ধারণা সম্পর্কে অবগত আছি, তা বেশিদিনের পুরনো নয়। শিল্পবিপ্লবের পর যখন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়, তখনই আমলাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা যখন অপর্যাপ্ত এবং শ্রমিকদেরকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে মনে হতে লাগলো তখন আমলাতন্ত্র তত্ত্ব হিসাবে, প্রকাশ করার জন্য অনেকেই কাজ করতে লাগলো। এ বিষয়ে Richard Hall, Michael Crosier ও Robert Matron এর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে এটিকে প্রসিদ্ধ করে তোলে Max Weber এবং তিনিই এর জনক হিসাবে পরিগণিত। **(গ) প্রক্রিয়া বা কার্য সংক্রান্ত অ্যাপ্রোচ (Process or Functional Approach):** মানুষের ধারণা ব্যবস্থাপনা হলো একটি সর্বজনীন বিষয় এবং সকল কাজের ক্ষেত্রেই এটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। তারা আরও মনে করে যে সব আকারের ও উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠানেই একই ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। তবে কিছু লোক ব্যবস্থাপনা কাজের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে এবং তারাই ব্যবস্থাপনাকে কার্যসংক্রান্ত অ্যাপ্রোচ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফ্রান্সের শিল্পপতি Henri Fayol কে এ অ্যাপ্রোচের জনক বলে অভিহিত করা হয়। তবে James D. Mooney, Luther Gullick, Lyndall Urwick এর মত প্রখ্যাত ব্যক্তিদেরও এ স্কুল বা মতবাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। Henri Fayol কে এ মতবাদের জনক বলা হয় এ কারণে যে, তিনিই সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপনাকে প্রক্রিয়া হিসাবে স্বীকৃতি দেন এবং বলেন, কীভাবে এ প্রক্রিয়া কতিপয় নীতির আলোকে কার্যকর হবে।

পাঠ-১.৫ নব্যধ্রুপদী মতবাদ; অন্যান্য মতবাদ
Neo-classical School; Others School

উদ্দেশ্য

- নব্যধ্রুপদী মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- অন্যান্য মতবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

নব্য ধ্রুপদী মতবাদ
Neo-classical School

নব্য ধ্রুপদী মতবাদ ধ্রুপদী মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বলা যায়, এটি ধ্রুপদী মতবাদেরই সম্প্রসারিত রূপ এবং ঠিক বিপরীত। ধ্রুপদী মতবাদ সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামোতে বিশ্বাস করে এবং মানুষকে অর্থনৈতিক উপাদান হিসাবে বিবেচনা করে। অন্যদিকে, নব্য ধ্রুপদী মতবাদে অনানুষ্ঠানিক কাঠামো, কাজের ক্ষেত্রে সামাজিক উপাদান এবং আবেগকে বিবেচনা করে। এ মতবাদের মূল ধারণা হলো কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকদেরকে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দিকগুলো বিবেচনায় আনতে হবে। এর আর একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো এটি কাজের ক্ষেত্রে মানুষকে অর্থনৈতিক উপাদান হিসাবে বিবেচনা না করে সামাজিক উপাদান হিসাবে বিবেচনা করে। নব্য ধ্রুপদী মতবাদ অস্থিতিস্থাপক প্রকৃতির এবং এতে সামাজিক বিজ্ঞানের সকল বিষয় সংযোজিত রয়েছে, যেমন: সমাজবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, সামাজিক ও শিল্প মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। এলটন মেয়ো (Elton mayo), হুগো মানস্টারবার্গ (Hugo Munsterberg), এফ. জে. রথলিজ বার্জার (F. J. Rothlis berger) উইলিয়াম জে, ডিকসন (William J. Dickson), হেনরি, এল, গ্যান্ট (Henry L. Gantt), ভিলট্রেবো পেরেটটো (Viltrevo Pareto), রেনসিস লাইকার্ট (Rensis Likert), ডগলাস ম্যাকগ্রেগর (Douglas McGregor), ক্রিস আরজেরিস (Chris Argyris), হাজবাগ (Herzberg), হার্বার্ট সাইমন (Herbert Simon), জেমস মার্চ (James Merch), মেরি পার্কার ফলেট (Mary Parker Follett) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ নব্য ধ্রুপদী মতবাদে অবদান রেখেছেন। এ মতবাদের তিনটি উপাদান রয়েছে। যেমন:

(ক) মানব সম্পর্ক মতবাদ
(খ) মানব সম্পদ মতবাদ
(গ) মানব সীমাবদ্ধতা মতবাদ

নীচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

(ক) মানব সম্পর্ক মতবাদ (Human Relation School)**:** এ মতবাদের মূল কথা হলো যেহেতু ব্যবস্থাপকগণ শ্রমিক-কর্মীদের দ্বারা কার্যসম্পাদন করিয়ে নেয়, তাই তাদের মধ্যে আন্ত:সম্পর্কের বিষয়সমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। মানুষের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা রয়েছে; এদের মধ্যে মর্যাদা ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি ব্যবস্থাপকদেরকে অধিক মনোযোগী হতে হবে। অর্থাৎ, শ্রমিক-কর্মীদের প্রেরণা, তদারকির স্টাইল, সংগঠনের প্রকৃতি, দলগত গতিশীলতা, ব্যক্তিক চলাফেরা, দলগত সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে অধিক জোর দিতে হবে। এ মতবাদ অনুসারে মানুষ হলো উৎপাদনের মূল চালিকা শক্তি, কাজের নিয়মকানুন বা মান ভালো কাজের নিশ্চয়তা দেয় না। প্রণোদিত কর্মীগণ, যারা প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তারা প্রতিষ্ঠানের সফলতা আনয়ন করতে পারে। অনেক পণ্ডিতবর্গ এ মতবাদের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন, তবে Elton Mayo এবং Hugo Munsterberg এর অবদান এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে Hugo Munsterberg "Psychology and Industrial Efficiency" নামে নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার" বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন এবং ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যের বিবরণ দেন। Elton Mayo অন্য এক ব্যক্তিত্ব যিনি হথর্ন গবেষণা (Hawthorne studies) এর জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। ১৯২৩-১৯৩২ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় শিকাগো শহরের ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক ফ্যাক্টরিতে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ গবেষণায় বৈজ্ঞানিকভাবে বেশি আলো ও

উৎপাদনশীলতা এর মধ্যে প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা হয় এবং এতে ২০ হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। এখানে বেশ কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো উৎপাদনশীলতায় 'শ্রমিকদের আবেগময় উপাদান পারিপার্শ্বিক উপাদানের চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। এ থেকে ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সাড়া জাগে যে, শ্রমিকদের মানবীয় উপাদানের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।

(খ) মানব সম্পদ মতবাদ (Human Resource Approach)**:** মানুষের শুধু চাহিদাই নাই, সে চাহিদা পূরণের সম্পদও তাঁদের মধ্যে রয়েছে। ব্যবস্থাপনাকে সম্পদ ব্যবহার করতে হবে এবং তার উপরই ব্যবস্থাপনার পারদর্শিতা নির্ভর করে। এখানে সম্পদ বলতে মানুষের কাজ করার ক্ষমতা ও দক্ষতাকে বুঝানো হয়েছে। Rensis Likert, Douglas McGregor, Chris Argyris, Herzberg এ মতবাদের উপর কাজ করেছেন এবং অবদান রেখেছেন। Rensis Likert যুক্তি দেন যে, কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদ। তাঁরা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হতে হবে। তিনি মনে করেন যে, তাঁদের নিকট থেকে ভালো ফলাফল পেতে হলে তাঁদেরকে একত্রিত করে সহযোগিতামূলক ও যোগ্য কর্মীদল গঠন করতে হবে। Douglas McGregor তাঁর বিখ্যাত 'Y' তত্ত্বে বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে দায়িত্ব খুঁজে ও বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তবে তা ব্যবহার করতে হবে। Chris Argyris পরীক্ষা করে দেখেন যে, আধুনিক আনুষ্ঠানিক সংগঠনে বিশেষীকরণের নীতি, পদের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করতে যেয়ে মানব সম্পদের অনেক ক্ষতি সাধন করেছে। Herzberg একজন বিখ্যাত শিল্প মনোবিজ্ঞানী। তিনি প্রেরণাদানকারী (Motivator) ও স্বাস্থ্যগত (Hygiene) উপাদানসমূহের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেন। তিনি পার্থক্য তুলে ধরেন যে, মানুষ বলে যে, কি তাদেরকে প্রেরণা দেয়, আর বাস্তবে কি তাদেরকে প্রণোদিত করে। তিনি আরও বলেন যে, "অর্থ হলো স্বাস্থ্যগত উপাদান, প্রেরণাদানকারী নয়। (Money is a hygiene factor and not a motivator)

(গ) মানব সীমাবদ্ধতা মতবাদ (Human Limitations School): মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই যৌক্তিক এবং বিভিন্ন সীমাবদ্ধতায় ভোগে। তাঁরা যখন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য দলবদ্ধভাবে কাজ করে, তখন পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্যের জন্য এবং তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য সমস্যায় পড়ে। এ মতবাদের মূল কথা হলো মানুষের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ধারণা, বিশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাই এ মতবাদকে সীমাবদ্ধ যুক্তি বা সীমিত যৌক্তিকতা (Limited logic or bounded rationality) নামেও অভিহিত করা হয়। Herbert Simon, James March, Cyret প্রমুখ এ মতবাদে অবদান রাখেন। Herbert Simon যুক্তি দেন যে, যেহেতু আমাদের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা সীমিত, তাই স্বল্প তথ্য নিয়ে কার্যকারণ সম্পর্কে মডেল (Model of causality) গঠন করতে হবে।Simonও March তাঁদের যৌথ গবেষণায় দেখেছেন যে, কী প্রণোদনা কর্মীদেরকে সংগঠনের কাজে অংশগ্রহণে প্রেরণা দেয়, কী তাঁদেরকে উৎপাদনে উৎসাহিত করে, আন্ত:বিরোধ ও অন্তঃবিরোধ দেখা দেয় কেন?

আধুনিক মতবাদ

Modern School

আধুনিক (Modern) শব্দটি দ্বিধান্বিত। কারণ পরিস্থিতি সব সময় পরিবর্তনশীল এবং আজ যা আধুনিক, কাল তা পুরাতন, অকেজো এবং বর্জনীয়। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এফ. ডব্লিউ টেলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও হেনরি ফেয়লের ব্যবস্থাপনার সর্বজনীন নীতিমালা দিয়ে আধুনিকতা শুরু হয়েছে। কিন্তু এগুলো ব্যবস্থাপনার প্রাচীন ধারণা। আধুনিক বলতে অতি সাম্প্রতিক বুঝায়। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিক বলতে বুঝায় বহুমুখী শৃঙ্খলা, বহুস্তরীয় এবং বহুমুখী ধারাকে বুঝায়। সাধারণত: ব্যবস্থাপনার ৫২ বছরের কার্যক্রমকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বলে অভিহিত করা হয়। Chester I Bernard ১৯৩৮ সালে তাঁর বিখ্যাত বই "The function of executive" প্রকাশ করেন, যা দ্বারা তিনি আধুনিক ব্যবস্থাপনার দিকপাল বনে পন। তবে এ ব্যবস্থাপনার স্থপতি হলেন এফ. ডব্লিউ টেলর। এ মতবাদ বহু জ্ঞানী-গুণীদের গবেষণা ও অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন Professor P.M.S Blackell, H. A. Simon, M. G. Kendall, I. Von Neumann, C. Shannon, F. W. Harris, W. Leontiff, L. V. Kan toro vich, R. A. Fisher, C. J. Thomam, F. E. Zimmerman, D. Katz, R. L. Khan, Joan Woodward, Paul Lawrence, James D. Thompson প্রমুখ। নীচে আধুনিক মতবাদের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো:

(ক) পরিমাণগত বা গাণিতিক মতবাদ (Quantitative Approach)**:** ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিমাণগত বা গণিত বিষয়সমূহ অতি পুরাতন। সেনাবাহিনী প্রশাসনে এটির ব্যবহার দীর্ঘদিনের। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কার্য গবেষণা (Operation Research) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যবসায় বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার খুবই সাম্প্রতিক। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যবহৃত হয়। এটিকে গাণিতিক মতবাদ, কার্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিমাণগত কৌশল এবং গাণিতিক গণনা পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গাণিতিক প্রক্রিয়া, ধারণা, সাংকেতিক চিহ্ন, মডেল ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। P.M.S Blacket, H. A. Simon, M. G. Kendall, J. Von Neumann প্রমুখ এ মতবাদের মূল অবদানকারী। সিদ্ধান্ত তত্ত্ব, মজুত নিয়ন্ত্রণ, রৈখিক কর্মসূচীকরণ (Linear programming) সম্ভাবনা তত্ত্ব, সাইমুলেশন তত্ত্ব প্রভৃতি এ তত্ত্বের কয়েকটি বিশেষ দিক যা বিশেষজ্ঞগণ আবিষ্কার ও প্রয়োগ করেছেন। ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান সকল দিকের ব্যবস্থাপনা সমস্যা মোকাবিলা করতে সক্ষম না হলেও উল্লিখিত কৌশলগুলো ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

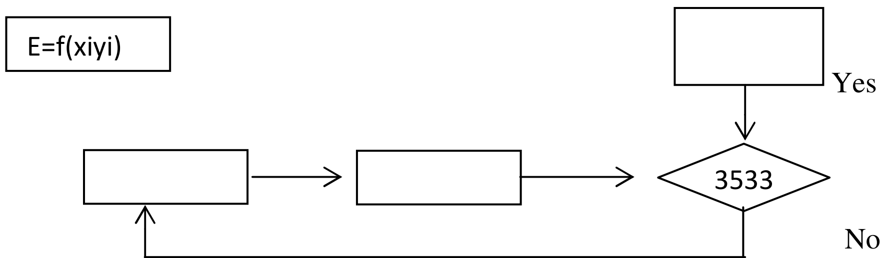

চিত্র: গাণিতিক মতবাদ

(খ) সিস্টেম মতবাদ (Systems Approach): সিস্টেম (system) শব্দটির অনেক অর্থ আছে, যেমন: আত্মনির্ভরশীল সেট, পারস্পরিক ক্রিয়াশীল উপাদান, কতকগুলো ইউনিটের সমষ্টি যা এমনভাবে সমন্বিত এবং সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে যাদের উৎপাদন স্বাধীনভাবে কাজ করে এমন ইউনিটের চেয়ে অধিক। এ মতবাদ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা সর্বদা চেষ্টা করে একটি সংগঠিত উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং পরস্পর বিভিন্ন অংশ সম্বলিত একটি সংগঠন তৈরি করতে। বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে কাজ করবে না, বরং একত্রে কাজ করবে। সিস্টেম এ্যাপ্রোচ অনুসরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ একটি প্রতিষ্ঠানকে সার্বিকভাবে দেখার সুযোগ পায়। সংগঠন হলো বৃহৎ সিস্টেমের অংশ। যেমন: সংগঠন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বাস করে, অর্থনৈতিক সিস্টেমে থেকে কাজ করে এবং সমাজে এটি চালিত হয়। এভাবে প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল গ্রহণ করে প্রক্রিয়াকরণ করে এবং সমাজের নিকট তা রপ্তানি করে বা বিক্রি করে। S. P Robbins ও Coulter বলেন, "সিস্টেম হলো আন্ত:সম্পর্কিত ও আন্ত:নির্ভরশীল অংশের সমষ্টি এমনভাবে সাজানো হয়, যা একটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া তৈরি করে। (A system is set of interrelated and interdepredent parts arranged in a manner that produces a unified whole.)

সিস্টেম দুই ধরনের। যেমন: (i) আবরিত সিস্টেম (Close System) এবং
(ii) খোলা সিস্টেম (Open System)

(i) আবরিত সিস্টেম (Close System): আবরিত সিস্টেম হলো এমন সিস্টেম হলো এমন সিস্টেম যা পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল নয়।

(ii) খোলা সিস্টেম (Open System): খোলা সিস্টেম আবরিত সিস্টেমের বিপরীত। এটি পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল।

প্রতিষ্ঠানকে যখন পরিবেশের উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হবে তখন এটি হবে খোলা সিস্টেম। কারণ প্রতিষ্ঠান পরিবেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে চূড়ান্ত পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে তা পরিবেশেই বণ্টন করে। এটি পরিবেশের সাথেই পারস্পরিক ক্রিয়াশীল। নিচের চিত্রে এটি দেখানো হলো:

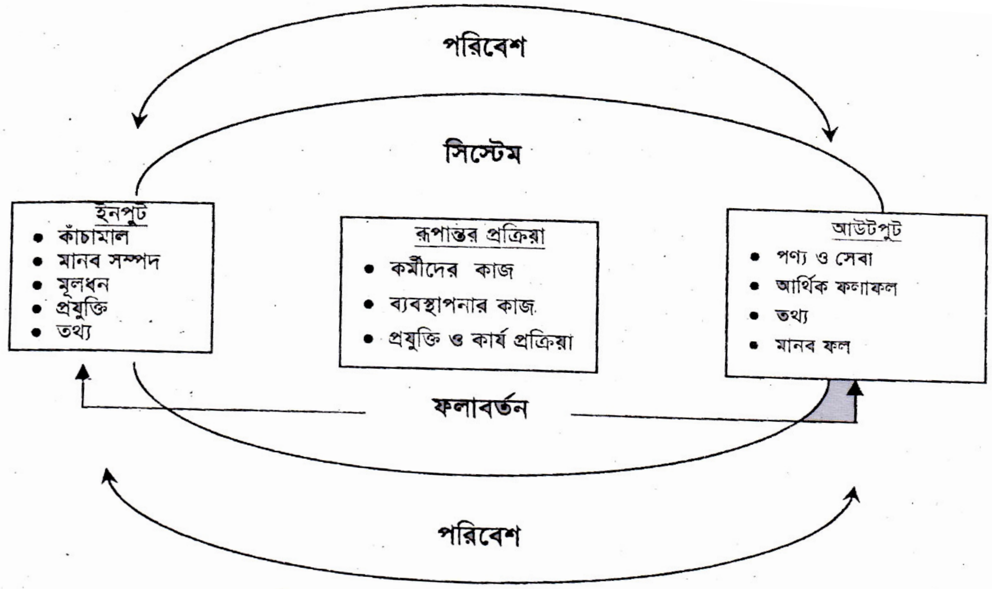

চিত্র (ক) ঃ খোলা সিস্টেম হিসেবে সংগঠন

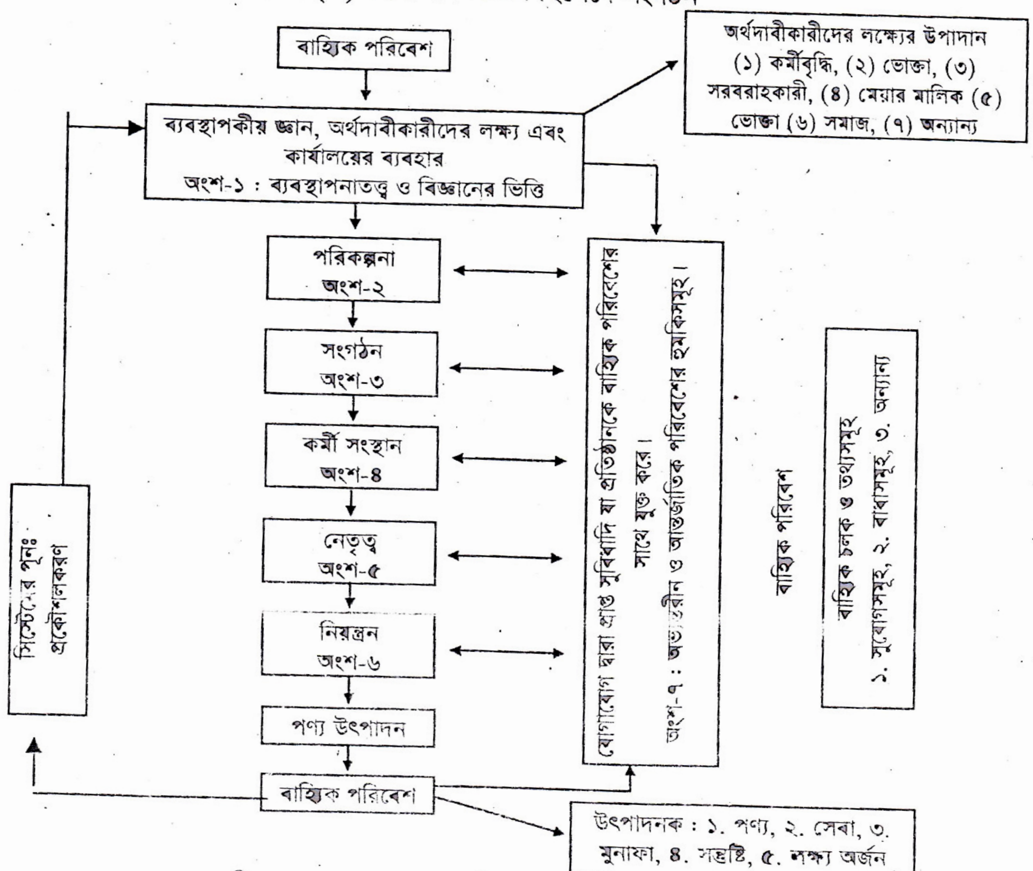

চিত্র ঃ (খ) ব্যবস্থাপনায় সিস্টেম এ্যাপ্রোচ।

উপর্যুক্ত সিস্টেম অ্যাপ্রোচের যে সকল উপাদান দেখানো হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১। ইনপুট ও অর্থ দাবিদার (Inputs & Claimants): বাহ্যিক পরিবেশ হতে ইনপুটের অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলো হলো মানুষ, মূলধন, ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা, কারিগরি দক্ষতা ও জ্ঞান, বিনিয়োগকারী, সরবরাহকারী প্রভৃতি। এ ছাড়াও বিভিন্ন দাবিদার রয়েছে যারা প্রতিষ্ঠানের নিকট অনেক কিছু দাবি করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ: কর্মীরা উচ্চ বেতন, বেশি সুযোগ এবং চাকরির নিশ্চয়তা চায়। ভোক্তারা যৌক্তিক মূল্যে নিরাপদ ও উচ্চ মুনাফার পাশাপাশি অর্থের নিশ্চয়তা চায়। সরকার প্রত্যাশা করে যে, প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি আইন মেনে চলবে এবং যথারীতি কর পরিশোধ করবে। সমাজ প্রতিষ্ঠানের নিকট দাবি করে যে, তারা পরিবেশ দূষণ করবে না এবং অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এ ছাড়াও, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শ্রমিকসংঘ, প্রতিযোগী প্রভৃতি পক্ষসমূহ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে যৌক্তিক আচরণ প্রত্যাশা করে। উল্লিখিত দাবিসমূহের অনেক দাবিই যৌক্তিক আচরণ প্রত্যাশা করে। উপর্যুক্ত দাবিসমূহের অনেক দাবিই অযৌক্তিক মনে হতে পারে ব্যবস্থাপকদের নিকট। তথাপি ব্যবস্থাপকদেরকে এ গুলোর মধ্যে সমন্বয় করে চলতে হবে। কখনো সমঝোতা করে। দাবি কাটছাঁট করে অথবা এড়িয়ে গিয়ে ব্যবস্থাপকদেরকে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে।

২। ব্যবস্থাপনা রূপান্তর প্রক্রিয়া (The managerial tramsformation process): ব্যবস্থাপকদের কাজ হলো ফলপ্রসূ ও দক্ষ উপায়ে ইনপুটসমূহকে রূপান্তরের মাধ্যমে আউটপুট বা চূড়ান্ত পণ্যে পরিণত করা। অবশ্য রূপান্তর প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হতে পারে। কেউ কেউ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠানের অর্থসংস্থান, উৎপাদন, কর্মী বাজারজাতকরণ প্রভৃতি কার্যের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে পারে। ব্যবস্থাপনার লেখকগণ বিভিন্ন অ্যাপ্রোচকে রূপান্তরের প্রক্রিয়া হিসাবে দেখেন। যাহোক, ব্যবস্থাপকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ব্যবস্থাপনা জ্ঞান সংগঠিতকরণ। সংগঠনকাঠামো তৈরিতে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি; যেমন: পরিকল্পনা সংগঠন, কর্মিসংস্থান নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করা হয়।

৩। যোগাযোগ সিস্টেম (The communication system): দুটি কারণে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সকল স্তরে যোগাযোগ প্রয়োজন। প্রথমত: এটি ব্যবস্থাপনা কাজের সমন্বয়সাধন করে। যেমন: পরিকল্পনার উদ্দেশ্য জ্ঞাত করে দেওয়া হয়, যেন যথাযথ সংগঠন কাঠামো তৈরি করা যায়। এ কাঠামোতে ভূমিকা পালনের জন্য ব্যবস্থাপকদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যোগাযোগের উপর নির্ভর করতে হয়। অধিকন্তু পরিকল্পনানুযায়ী কার্য সম্পাদিত হচ্ছে কিনা, তা যোগাযোগের মাধ্যমে জানা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সিস্টেম অ্যাপ্রোচের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো যে-কোনো প্রতিষ্ঠান পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে এবং পরিবেশ থেকে ইনপুট গ্রহণ করে তা রূপান্তরের মাধ্যমে পণ্য, সেবা উৎপাদন করে তা পরিবেশেই বণ্টন করে দেয়।

দ্বিতীয়ত: যোগাযোগের আর একটি উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানকে বাহ্যিক পরিবেশের সাথে যুক্ত করে দেয়া। ভোক্তারা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষার প্রাণ। তারা প্রতিষ্ঠানের বাইরে অবস্থান করে। যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের চাহিদা, রুচি, ফ্যাশন প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারে।

৪। বাহ্যিক চলকসমূহ (External Variables): ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপকগণ প্রতিনিয়তই বাহ্যিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেন। এটি সত্য যে, বাহ্যিক পরিবেশকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা ব্যবস্থাপকদের নাই, তথাপি পরিবেশের প্রতি সাড়া দেওয়া ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প থাকে না।

৫। আউটপুট (Out Put): ব্যবস্থাপকদের কাজ হলো ব্যবস্থাপনা কার্যের মাধ্যমে বাহ্যিক পরিবেশকে বিবেচনায় এনে ইনপুটকে সংগ্রহ, ব্যবহার ও রূপান্তর করে আউটপুটে পরিণত করা। এগুলো হলো পণ্য, সেবা, মুনাফা ও সন্তুষ্টি প্রভৃতি।

৬। সিস্টেম পুন: শক্তিশালীকরণ (Restrengthening system): ব্যবস্থাপনা সিস্টেম মডেলে কিছু আউটপুট পুনরায় ইনপুট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: কর্মীদের সন্তুষ্টি ও নতুন জ্ঞান বা দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ মানব ইনপুট হতে পারে। একইভাবে মুনাফা, ব্যয়ের উদ্বৃত্ত পুনরায় বিনিয়োগ হতে পারে। এটি নগদ অর্থেও হতে পারে, আবার মূলধন যন্ত্রপাতিতেও হতে পারে।

আলফ্রেড কোরজিসকি (Alfred Korzyhski), চেষ্টার আই বার্নার্ড (Chester I Bernard), ই, এল, ট্রিস্ট (E. L. Trist), এফ, ই. ইমারি (F. E Emery), ডি. কাজ (D. Katz), আর এল. খান (R. L. Khan) প্রমুখ এই মতবাদে অবদান রেখেছেন।

(গ) পরিস্থিতি বা বিকল্প অ্যাপ্রোচ (Contingency or Situation Approach): পরিস্থিতি বা বিকল্প বলতে বুঝায় প্রয়োজনানুযায়ী বিকল্প কার্যসমূহ গ্রহণ করা। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিস্থিতিমূলক বা বিকল্প এর অর্থ হলো সকল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য কোনো একক পদ্ধতিই ফলপ্রসূ নয় এবং ব্যবস্থাপকগণ এ ক্ষেত্রে কার্যসম্পাদনে যে-কোনো পন্থা ব্যবহারের জন্য স্বাধীন হন। এ মতবাদ অনুসারে ব্যবস্থাপনায় গতানুগতিক নীতি প্রয়োগ থেকে আধুনিক ধারায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় অপর্যাপ্ত বলে মনে করেন। পরিস্থিতি অ্যাপ্রোচ প্রবর্তনকারীদের মূল ধারণা হলো প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তির প্রকৃতি, প্রতিষ্ঠানের আকার, আইনগত ব্যবস্থা, বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য উপাদান যা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে অসুবিধার সৃষ্টি করে, এগুলোকে সাংগঠনিক কাঠামোর সাথে সংগতিবিধান করতে হবে।

জন উডওয়ার্ড (John Woodward) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ব্যবস্থাপনায় পরিস্থিতি বা বিকল্প অ্যাপ্রোচ প্রবর্তন করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি তার গবেষণাপত্র "প্রযুক্তি ও সংগঠন" (Technology & Organization) প্রকাশ করেন যা এ অ্যাপ্রোচের মূল উপাত্ত হিসাবে পরিগণিত। অন্যান্য বিখ্যাত অবদানকারীগণ হলেন জি,এম,স্টেকার (G. M. Stalker), পল লরেন্স (Paul Lawrence), জেমস ডি, থম্পসন (James D. Thomson) প্রমুখ। পরিস্থিতি বা বিকল্প অ্যাপ্রোচটি বর্তমান সময়ে সংগঠনের সংকট মোকাবিলার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যার বহুমুখী শৃঙ্খলা রয়েছে। এটি বয়সের দিক থেকে ছোট বা যৌবনপ্রাপ্ত। বহুমুখী শৃঙ্খলার ক্ষেত্রগুলো অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জনপ্রশাসন, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান প্রভৃতি। ব্যবস্থাপনার অ্যাপ্রোচগুলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যথাযোগ্য মনে হলেও ব্যবস্থাপনার মূল তত্ত্বগুলো একই রকম।

উপর্যুক্ত মতবাদ ব্যতীত আরও কিছু মতবাদ রয়েছে যা নিম্নরূপ:

(ঘ) পরীক্ষামূলক বা ঘটনা মতবাদ
Empirical Case Approach

বৈশিষ্ট্য	সীমাবদ্ধতা	চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা
১. অভিজ্ঞতার আলোকে ঘটনা বিশ্লেষণ। ২. সাফল্য ও ব্যর্থতা চিহ্নিতকরণ।	১. প্রতিটি অবস্থা বা ঘটনা আলাদা। ২. নীতি চিহ্নিতকরণে কোনো প্রচেষ্টা নাই। ৩. ব্যবস্থাপনাতত্ত্ব উন্নয়নে সীমিত মূল্যায়ন	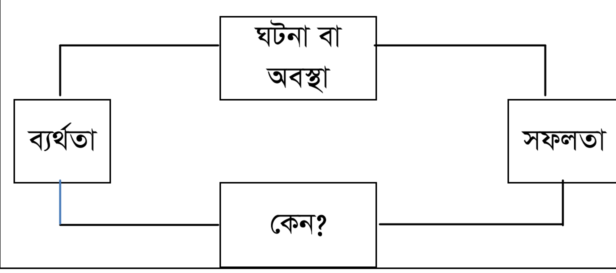

(ঙ) সিদ্ধান্ত তত্ত্ব মতবাদ
Decision Theory Approach

বৈশিষ্ট্য	সীমাবদ্ধতা	চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা
১. সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর আলোকপাত, ব্যক্তিক বা দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া। ২. কতিপয় তত্ত্ববিদ প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম বিশ্লেষণে সিদ্ধান্তকে স্প্রিংবোর্ডের মতো ব্যবহার করেছে। ৩. গবেষণার সীমা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট নয়।	১. সিদ্ধান্ত গ্রহণের তুলনায় ব্যবস্থাপনার কাজে বেশি। ২. একই সময়ে সংকীর্ণ ও উদার উভয় দিকে আলোকপাত করে।	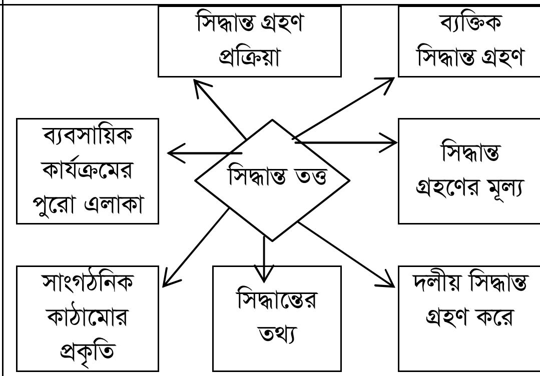

(চ) পুন: প্রকৌশল মতবাদ
Reengineering Approach

বৈশিষ্ট্য	সীমাবদ্ধতা	চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা
১. মৌলিক বিষয়সমূহে পুনঃচিন্তা ২. প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ ৩. দ্রুত ৪. পুনঃসজ্জিতকরণ	১. কর্মীদের মানবীয় দিকের প্রতি উদাসীনতা। ২. ভোক্তাদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি না দেয়া।	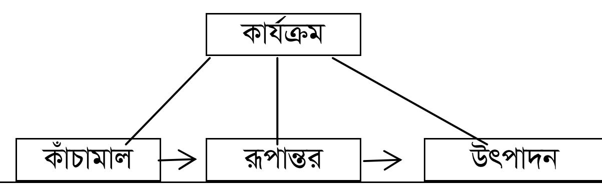

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ নব্য-ধ্রুপদী মতবাদ সম্পর্কে এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবেন।

সারসংক্ষেপ

নব্য ধ্রুপদী মতবাদে অনানুষ্ঠানিক কাঠামো, কাজের ক্ষেত্রে সামাজিক উপাদান এবং আবেগকে বিবেচনা করে। এ মতবাদের মূল ধারণা হলো কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকদেরকে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দিকগুলো বিবেচনায় আনতে হবে। এর আর একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো এটি কাজের ক্ষেত্রে মানুষকে অর্থনৈতিক উপাদান হিসাবে বিবেচনা না করে সামাজিক উপাদান হিসাবে বিবেচনা করে। এ মতবাদের তিনটি উপাদান রয়েছে। যেমন: **(ক)মানবীয় সম্পর্ক মতবাদ** (Human Relation School)ঃ এ মতবাদের মূল কথা হলো যেহেতু ব্যবস্থাপকগণ শ্রমিক-কর্মীদের দ্বারা কার্যসম্পাদন করিয়ে নেয়, তাই তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের বিষয়সমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। মানুষের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা রয়েছে; এদের মধ্যে মর্যাদা ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি ব্যবস্থাপকদেরকে অধিক মনোযোগী হতে হবে। অর্থাৎ, শ্রমিক-কর্মীদের প্রেরণা, তদারকির স্টাইল, সংগঠনের প্রকৃতি, দলগত গতিশীলতা, ব্যক্তিক চলাফেরা, দলগত সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে অধিক জোর দিতে হবে। এ মতবাদ অনুসারে মানুষ হলো উৎপাদনের মূল চালিকা শক্তি, কাজের নিয়ম-কানুন বা মান ভালো কাজের নিশ্চয়তা দেয় না। প্রণোদিত কর্মীগণ যারা প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তারা প্রতিষ্ঠানের সফলতা আনয়ন করতে পারে। **(খ) মানব সম্পদ মতবাদ** (Human Resource Approach)ঃ মানুষের শুধু চাহিদাই নাই, সে চাহিদা পূরণের সম্পদও তাদের মধ্যে রয়েছে। ব্যবস্থাপনাকে সম্পদ ব্যবহার করতে হবে এবং তার উপরই ব্যবস্থাপনার পারদর্শিতা নির্ভর করে। এখানে সম্পদ বলতে মানুষের

কাজ করার ক্ষমতা ও দক্ষতাকে বুঝানো হয়েছে। Rensis Likert, Douglas McGregor, Chris Argyris, Herzberg এ মতবাদের উপর কাজ করেছেন এবং অবদান রেখেছেন। Rensis Likert যুক্তি দেন যে, কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদ। তাঁরা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হতে হবে। তিনি মনে করেন যে, তাঁদের নিকট থেকে ভালো ফলাফল পেতে হলে তাঁদেরকে একত্রিত করে সহযোগিতামূলক ও যোগ্য কর্মীদল গঠন করতে হবে। Douglas McGregor তাঁর বিখ্যাত 'y' তত্ত্বে বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে দায়িত্ব খুঁজে ও বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তবে তা ব্যবহার করতে হবে। **(গ) মানব সীমাবদ্ধতা মতবাদ (Human Limitations School):** মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই যৌক্তিক এবং বিভিন্ন সীমাবদ্ধতায় ভোগে। তাঁরা যখন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য দলবদ্ধভাবে কাজ করে, তখন পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্যের জন্য এবং তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য সমস্যায় পড়ে। এ মতবাদের মূল কথা হলো মানুষের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তার জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ধারণা, বিশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাই এ মতবাদকে সীমাবদ্ধ যুক্তি বা সীমিত যৌক্তিকতা (Limited logic or bounded rationality) নামেও অভিহিত করা হয়। আধুনিক বলতে অতি সাম্প্রতিক বুঝায়। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিক বলতে বুঝায় বহুমুখি শৃংখলা, বহুস্তরীয় এবং বহুমুখি ধারাকে বুঝায়। সাধারণ ব্যবস্থাপনার ৫২ বছরের কার্যক্রমকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বলে অভিহিত করা হয়। Chester I Bernard ১৯৩৮ সালে তাঁর বিখ্যাত বই "The function of executive" প্রকাশ করেন, যা দ্বারা তিনি আধুনিক ব্যবস্থাপনার দিকপাল বনে যান। তবে এ ব্যবস্থাপনার স্থপতি হলেন এফ. ডব্লিউ টেলর। এ মতবাদ বহু জ্ঞানী-গুণীদের গবেষণা ও অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন Professor P.M.S Blackell, H. A. Simon, M. G. Kendall, J. Von Neumann, C. Shannon, F. W. Harris, W. Leontiff, L. V. Kan toro vich R, A. Fisher, C. J. Thomam, F. E. Zimmerman, D. Katz, R. L. Khan Joan Woodward, Paul Lawrence James D. Thompson প্রমুখ। নীচে আধুনিক মতবাদের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো: **(ক) পরিমাণগত বা গাণিতিক মতবাদ** (Quantitative Approach)**:** ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিমাণগত বা গণিত বিষয়াদি অতি পুরাতন। সেনাবাহিনী প্রশাসনে এটির ব্যবহার দীর্ঘদিনের। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কার্য গবেষণা (Operation Research) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যবসায় বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার খুবই সাম্প্রতিক। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যবহৃত হয়। এটিকে গাণিতিক মতবাদ, কার্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিমাণগত কৌশল এবং গাণিতিক গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। **(খ) সিস্টেম মতবাদ (Syetems Approach):** সিস্টেম (system) শব্দটির অনেক অর্থ আছে, যেমন: আত্মনির্ভরশীল সেট, পারস্পরিক ক্রিয়াশীল উপাদান, কতকগুলো ইউনিটের সমষ্টি যা এমনভাবে সমন্বিত এবং সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে যাদের উৎপাদন স্বাধীনভাবে কাজ করে এমন ইউনিটের চেয়ে অধিক। এ মতবাদ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা সর্বদা চেষ্টা করে একটি সংগঠিত উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং পরস্পর বিভিন্ন অংশ সম্বলিত একটি সংগঠন তৈরি করতে। বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে কাজ করবে না, বরং একত্রে কাজ করবে। সিস্টেম এ্যাপ্রোচ অনুসরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ একটি প্রতিষ্ঠানকে সার্বিকভাবে দেখার সুযোগ পায়।

পাঠ-১.৬ ব্যবস্থাপনা দর্শন, ব্যবস্থাপনা দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান; ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্ম
Management Philosophy, Influencing Factors of Management Philosophy; The Birth of Management Ideas

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবস্থাপনা দর্শন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনা দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা দর্শন
Management Philosophy

ব্যবস্থাপনার আত্মপরিচয় পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, মানব সভ্যতা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্রমবিকাশ ও সম্প্রসারণের সাথে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নেরও একটি যোগসূত্র রয়েছে। সভ্যতার যেমন বিকাশ ঘটেছে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পেরও তেমন বিকাশ ঘটেছে। ফলশ্রুতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনার উদ্ভব ঘটেছে এবং অনেক চড়াই-উতরাই পাড় হয়ে আজ এটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এতে বিভিন্ন মনীষীগণ, চিন্তাবিদ, গবেষক ও শিল্প উদ্যোক্তা ব্যবস্থাপনা দর্শন উন্নয়ন করার জন্য ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছেন। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদের ধারণা, চিন্তা ভাবনা সময়ের বিবর্তনে ব্যবস্থাপনা দর্শন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং বলা যায় যে, যে সকল জ্ঞান ও ধারণা লাভ করলে একজন ব্যবস্থাপক যাবতীয় ব্যবস্থাপনা কার্য সফলতার সাথে সম্পাদন করতে পারেন তাকে ব্যবস্থাপনা দর্শন বলা হয়।

বিভিন্ন মনীষী ব্যবস্থাপনা দর্শনের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

G. R Terry বলেছেন, "Management Philosophy is a body of Knowledge and beliefs that supply a broad basis for determining solutions to managerial problems." অর্থাৎ, ব্যবস্থাপনা দর্শন হলো কতকগুলো জ্ঞান ও বিশ্বাসের সমাহার যা ব্যবস্থাপকীয় সমস্যা সমাধানের বৃহৎ ভিত্তি প্রদান করে।

J. L Massie বলেছেন, "Philosophy of management refers to those general concept and integrated attitudes that are fundamental of the Co-operation of a social group."অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা দর্শন হলো সে-ই সকল সাধারণ ধারণা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভাব যা সামাজিক দলের সহযোগিতার ভিত্তি প্রদান করে।

সুতরাং বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা দর্শন হলো ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা, বিশ্বাস ও মনোভাবের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা কাঠামো যা ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং চিন্তাভাবনা ও আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে।

ব্যবস্থাপনা দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
Influencing Factors of Management Philosophy

কোনো বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, বিশ্বাস, মনোভাবের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ব্যবস্থাপনার যে কাঠামো গ্রহণ প্রক্রিয়া, চিন্তাভাবনা, আচার-ব্যবহার ও কাজে-কর্মে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তাকে ব্যবস্থাপনা দর্শন বলে। ব্যবস্থাপনা দর্শন বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। নীচে এ সকল উপাদান তুলে ধরা হলো:

১. **সমাজ (Society):** একটি সমাজ গড়ে ওঠে মূলত ভৌগলিক অবস্থান, ধর্ম, শিক্ষা, মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ সামাজিক সমস্যা সমাধান ও চাহিদা পূরণে ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উৎপাদন, বণ্টন, কর্মসংস্থান প্রভৃতি কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২. **শিক্ষা (Education):** শিক্ষা মানুষের প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলে। তাই শিক্ষিত মানুষ চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা দর্শন প্রয়োগে ব্যবস্থাপকদেরকে প্রভাবিত করে।

৩. **অর্থনীতি (Economics):** প্রতিটি অর্থনৈতিক বিষয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে। মূলত সরকারের আর্থিক কাঠামো, আর্থিক নীতি, শিল্প নীতি, অর্থসংস্থান, বাজারের আয়তন, ক্রয়-ক্ষমতা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে। তাই অর্থনৈতিক উপাদান বিবেচনা করে কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনাকে প্রয়োজনীয় দর্শন প্রয়োগ করতে হয়।

৪. **প্রযুক্তি (Technology):** বর্তমানে প্রতিনিয়ত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হচ্ছে। এতে উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশের সাথে প্রযুক্তিগত দিক থেকে সমান তালে এগুতে পারছেনা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক গতিশীলতা সৃষ্টি করা যায়। এমতাবস্থায়, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে কাজে লাগিয়ে ব্যবস্থাপনা প্রয়োজনীয় দর্শন প্রয়োগ করে থাকে।

৫. **সরকার (Government):** প্রতিটি দেশেই সরকারের নিজস্ব কিছু আইনকানুন, দর্শন, বিধি-নিষেধ বিদ্যমান থাকে। সকলকে এগুলো মেনেই কাজ করতে হয়। ফলে সরকারি আইনকানুন, বিধি-নিষেধ ও প্রচলিত দর্শন বিবেচনা করে ব্যবস্থাপনাকে নিজস্ব দর্শন প্রয়োগ করতে হয়।

৬. **আইনগত পরিবেশ (Legal Environment):** আইনগত পরিবেশ একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই দেশে প্রচলিত শিল্প ও বাণিজ্যিক আইন, কারখানা আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এগুলো ব্যবস্থাপনা দর্শনকে প্রভাবিত করে।

৭. **জনসংখ্যা (Population):** দেশের জনসংখ্যার গঠন, গতি-প্রকৃতি, ঘনত্ব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ: দেশে কর্মক্ষম জনগণের সংখ্যা বাড়লে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল ও গতিশীল থাকে। আবার কর্মক্ষম জনগণের সংখ্যা কমলে বিদেশি জনশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। তাই জনসংখ্যার গঠন ও গতিপ্রকৃতি বিবেচনা করে ব্যবস্থাপনার দর্শন প্রয়োগ করতে হয়।

চিত্র: ব্যবস্থাপনা দর্শনের উপর পরিবেশের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানমূহ।

উপর্যুক্ত পরিবেশের উপাদানসমূহ বিবেচনা করে ব্যবস্থাপনাকে প্রয়োজনীয় দর্শন উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হয়। কারণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে উক্ত উপাদানসমূহ নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্ম

The Birth of Management Ideas

বা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা বিশারদদের অবদান

Contribution of Management Expert in the Development of Management

বর্তমান কালের ব্যবস্থাপনার জ্ঞান দীর্ঘদিনের গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলশ্রুতি। নীচে ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের উৎপত্তি ও একই সাথে তত্ত্বসমূহের উদ্ভাবক সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১। **প্রাক্ধ্রুপদী সময়ের অবদানকারীগণ** (Pre-Classical Contributors): ১৮০০ শতকের মাঝামাঝি ও শেষ দিকে বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি সম্পর্কে অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রবার্ট ওয়েন (Robert Owen),চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) এবং হেনরি আর. টাউনি (Henry R. Towne) প্রমুখ।

(ক) রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) : রবার্ট ওয়েন ১৭৭১ সালে ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৮ সালে মৃত্যুবরণ করেণ। তিনি একজন সফল বৃটিশ উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতিষ্ঠানে মানব সম্পদকে গুরুত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন অগ্রদূত। তিনি স্কটল্যান্ডের লানার্ক নামক স্থানে একটি বস্ত্র মিল পরিচালনা করতেন। সেখানে তিনি কর্মীদের কার্যপরিবেশ ও বসবাসের উন্নয়নের দিকে বেশ নজর দিয়েছিলেন এবং তাদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের জন্য উৎসাহী ছিলেন। তিনি রাস্তা-ঘাট, বাড়ী, পায়খানা এবং শিক্ষা ব্যাবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করেছিলেন। তিনি মনে করতেন শ্রমিকদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। তিনি যুক্তি দেখান যে, "শ্রমিকদের কার্যপরিবেশের উন্নয়ন করলে শুধু জীবন মানের উন্নয়নই হয় না, এতে শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ উৎপাদনশীলতাও বাড়ে।" তিনিই আধুনিক কর্মী ব্যবস্থাপনা বা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার জনক।

(খ) চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage): চার্লস ব্যাবেজ ছিলেন একজন ইংরেজ গণিতজ্ঞ। তিনি ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি গণনার পিতা (The father of computing) নামে খ্যাত। তিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ম্যাকানিক্যাল ক্যালকুলেটর ও বিশ্লেষণাত্মক ইঞ্জিন (Analytical Engine) তৈরি করেন। এতে আধুনিক দৈনন্দিন ক্যালকুলেটরের উপাদানও ছিল। তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করার নতুন নতুন পদ্ধতি বের করতেন এবং এইভাবেই তিনি ব্যবস্থাপনার প্রতি অবদান রাখেন। তিনি কার্য বিশেষীকরণের প্রতি বেশি জোর দিয়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেন যে, শুধু শারীরিক কাজই বিশেষীকরণ করা যায় না, মানসিক কাজও বিশেষীকরণ করা যায়। তিনি মুনাফায় অংশগ্রহণ পরিকল্পনাও (Profit Sharing Plan) উদ্ভাবন করেন যার দুটি অংশ, যেমন: বোনাস, যা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্য দেওয়া যায় এবং মজুরির অংশ, যা ফ্যাক্টরির মুনাফার উপর ভিত্তি করে দেওয়া যায়।

(গ) হেনরি আর টাউনি (Henry R. Towne) :হেনরি আর. টাউনি ইয়েলি ও টাউনি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এবং একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি ১৮৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।তিনি ব্যবস্থাপনাকে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি বা বিজ্ঞান হিসাবে অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। তিনি তাঁর মতামতকে তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধ "The Engineer as an Economist" - এ ব্যক্ত করেন। এটি ১৮৮৬ সালে আমেরিকার ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সমিতি - এর সম্মেলনে উপস্থাপন করেন। সে সম্মেলনে F. W. Taylor উপস্থিত ছিলেন।

২। **ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গি (Classical Viewpoint)**: Henry R. Towne ব্যবস্থাপনাকে একটি আলাদা জগত হিসাবে প্রতিষ্ঠার যে আহবান করেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করে যে নতুন অ্যাপ্রোচ বা ধারা আবিষ্কৃত হয়, তাই হলো ধ্রুপদী ধারা (Classical approach /Viewpoint)। এ ধারার মূল কথা হলো 'কাজ ও সংগঠন' কে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা। এ ধারার তিনটি প্রধান ধারা রয়েছে, যেমন: বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং আমলাতন্ত্র। নীচে এ সকল ধারায় অবদানকারীদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

(ক) ফ্রেডারিক উইনস্লো টেলর (Frederic Winslow Taylor): এফ. ডব্লিও টেলর ১৮৫৬ সালে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়। তিনি Henry R. Towne এর চ্যালেঞ্জ

গ্রহণ করেন এবং ব্যবস্থাপনাকে একটি স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে আবিষ্কার করেন। এতে শ্রমিক-কর্মীদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তিনি ১৮৭৫ সালে প্রথমে স্থানীয় একটি ফার্মের প্যাটার্ন মেকার (Pattern maker) এ শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে মেকানিক পদে অধিষ্ঠিত হন। অতপর তিনি ১৮৭৮ সালে ফিলাডেলফিয়ায় অবস্থিত মিডভ্যাল স্টিল কোম্পানিতে মেকানিক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি একজন শিক্ষানবীশ, সাধারণ শ্রমিক, একজন ফোরম্যান, একজন মাস্টার মেকানিক ও পরে চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ সবই তাঁকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার বাস্তব চিত্র দেখতে ও অনুধাবন করতে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এতে তিনি শ্রমিকদের মনোভাবও বুঝতে পারেন। ফলে তিনি ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নের পথের সন্ধান পান। তিনি ১৯০১ সালে ৪৫ বৎসর বয়সে চাকরি থেকে অবসর নাই এবং পরবর্তী ১৪ বছর তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিনাবেতনে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উপর তার মতামত ও ধারণা তুলে ধরেন।

তাঁর কাজের প্রধান দিক হলো উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং একই সাথে শ্রমিকদের মজুরিও বৃদ্ধি করা। তিনি দেখেন যে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে মজুরি ও মুনাফা উভয়ই বৃদ্ধি পায়। কাজের ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতির চেয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে স্বল্প শ্রম ও স্বল্প খরচে বেশি উৎপাদন করা সম্ভব। তিনি ১৯১১ সনে বিখ্যাত বই লেখেন, যার নাম হলো ''Principles of Scientific Management" এবং "Shop Managenet" ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি তার কাজের সময় নিরীক্ষা এবং শ্রান্তি নিরীক্ষা' পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি ১৯১২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

(খ) Henry L. Gantt(হেনরি এল.গ্যান্ট): Henry L. Gantt একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ১৯৬১ সালে আমেরিকার ফিলাডাফিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৭ সালে মিডভ্যাল স্টিল কোম্পানিতে টেলরের সাথে যোগদান করেন এবং ১৯০১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে তাঁর সাথে ছিলেন। অত:পর তিনি নিজেই ইঞ্জিনিয়ারিং কনসাল্টিং ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন এবং কনসাল্টিং কাজে টেলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ধারণা কাজে লাগান। তিনি শ্রমিকদেরকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্বাচিত করেন এবং প্রণোদনামূলক বোনাস সিস্টেমের উন্নয়ন করেন। টেলরের মত তিনিও ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের উপর জোর দেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বলেন। Henry L. Gantt পরিকল্পনাকে গ্রাফিক চিত্রে প্রকাশের জন্য অধিক খ্যাতি লাভ করেন যা দিয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এ চার্ট গ্যান্ট চার্ট নামে পরিচিত। কাজের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণে তিনি 'সময়' ও 'খরচ' উভয়ের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি প্রকল্প মূল্যায়নের আধুনিক কৌশল ও (PERT) ব্যবহার করেন।১৯১৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(গ) Frank and Lillian Gilbreth (ফ্রাঙ্ক এন্ড লিলিয়ান গ্রিলব্রেথ): বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অন্য দুজন সমর্থনকারী ও উন্নয়নকারী হলেন ফ্রাঙ্ক ও লিলিয়ান গিলব্রেথ (Frank1868-1924 and Lillian Gilbreth (1878-1972) দম্পতি। যদিও ফ্রাঙ্ক আমেরিকার মেসাচুসেট ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ভর্তি হওয়ার যোগ্য ছিলেন, তথাপি তিনি ১৮৮৫ সালে ১৭ বছর বয়সে রাজমিস্ত্রি (Bricklayer) হলেন। কারণ সে সময় এ পেশার খুব গুরুত্ব ছিল। দশ বছর পর তিনি বিল্ডিং কন্ট্রাকটিং ফার্মের প্রধান সুপরিনটেন্ডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এর কিছু দিন পরই তিনি নিজের কনস্ট্রাকশন ফার্মের মালিক হয়েছিলেন। এ সময় তিনি কাজের ক্ষেত্রে গতির সময় কমানোর ক্ষেত্রে জোর দেন। তিনি রাজমিস্ত্রির কাজের ক্ষেত্রে গতি ১৮ থেকে ৫এ নামিয়ে আনেন এবং এতে কোনো খরচ বৃদ্ধি ব্যতীতই উৎপাদনশীলতা দ্বিগুন বৃদ্ধি পায়।১৯০৭ সালে যখন টেলরের সাথে তাঁর দেখা হয়, তখন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সাথে তার ধারণাকে একত্রে করেন। Lillin Gilbreth তার স্বামী Frank Gilbreth কে কাজে সাহায্য করতেন। তিনি শিল্প মনোবিজ্ঞানী ছিলেন এবং তার বিয়ের ৯ বছর পর ১৯১৫ সালে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এ সময়ে তিনি ১২ জন ছেলে-মেয়েকেও বড় করে তোলেন। ১৯২৪ সালে ফ্রাঙ্ক হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তখন লিলিয়ান তার কনসাল্টিং ফার্মের দায়িত্ব নাই। এ সময় তিনি দুটি কাজ করেন, যেমন: নতুন কিছুর জন্য উদ্ভাবনী গবেষণা এবং কনসাল্টিং কাজ। তিনি Purdue University এর ব্যবস্থাপনার প্রফেসর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি বিজ্ঞান হিসাবে উন্নয়নের জন্য এবং এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে "First Lady of Management" খেতাবে ভূষিত করা হয়। তিনি সারাজীবন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য কাজ করেন, যা ১৯৭২ সালে ৯৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণের মধ্যদিয়ে শেষ হয়।

এ দম্পতি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। লিলিয়ান দেখতেন কার্যক্ষেত্রে মানবীয় দিক (Human Aspect), আর ফ্রাঙ্ক দেখতেন দক্ষতা (Eficiency)। সত্যিই এ বিরল প্রতিভার সমন্বয় খুব কমই হয়।

(ঘ) হেনরি ফেয়ল (১৮৪১-১৯২৫) Henri Fayol (1841-1925): হেনরি ফেয়ল ফ্রান্সের নিয়নের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন শিল্পপতি ছিলেন। তিনি খনি প্রকৌশলী (Mining Engineer) হিসাবে প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং Coal & Iron Combineকোম্পানিতে যোগদান করেন। ১৮৮৮ সালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ৭৭ বছর বয়সে কোম্পানিটিকে মারাত্মক সংকট থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে শক্ত অবস্থানে নিয়ে আসেন। কোম্পানিটি এখন ফ্রান্সের বড় কোম্পানি হিসাবে খ্যাত। ফ্রান্সের শিল্পপতি হেনরি ফেয়লকে আধুনিক কার্য ব্যবস্থাপনার সত্যিকার পিতা (Father) হিসাবে গণ্য করা হয়। ব্যবস্থাপনার প্রতি তার এ বিশাল অবদান তৎকালীন আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের পন্ডিতগণ ১৯২০ সালের আগে জানতে পারেনি। ১৯১৬ সালে তার প্রথম বই "Administration Industrielle et General" নামে প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালে এটি ইংল্যান্ডে প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয় যার নাম হয়, General &Industrial Management আমেরিকায় এটি ১৯৪৯ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। যদিও ১৯২৩ সালে Sarah Geer নামে এক পন্ডিত ফেয়লের কাজের উপর একটি নিবন্ধ অনুবাদ করে সাড়া জাগিয়েছিল। পরবর্তীকালে বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পণ্ডিত Gulick ও Urwick ফেয়লের সমস্ত কাজ সংগ্রহ করেন। ফেয়ল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেন। যেমনঃ কারিগরি (Technical), উৎপাদন (Production), বাণিজ্যিক (ক্রয়-বিক্রয়), আর্থিক (মূলধন সংগ্রহ, ব্যবহার) নিরাপত্তা (সম্পদের ও মানুষের), হিসাব (পরিসংখ্যানসহ) ও ব্যবস্থাপনা (পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ)। তিনি লক্ষ্য করেন যে, এ সকল কার্যাবলি সব আকারের ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য। তিনি ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বা উপাদান, যেমনঃ পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ এর জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর এ কার্যক্রম বিভিন্নভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে এবং সাত দশক পরীক্ষানিরীক্ষার পরও এগুলো বৈধ ও যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি বার বার উল্লেখ করেন যে, তার দেওয়া ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ শুধু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেই প্রযোজ্য নয়, এগুলো রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সেবামূলক, সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্যও প্রযোজ্য। এ সব কারণেই তাকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়।

৩। নব্য ধ্রুপদী মতবাদের অনুসারীগণ:

(ক) চেষ্টার আই, বার্নাড (Chester I. Bernard): চেষ্টার আই. বার্নার্ড প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার আর-একজন অবদানকারী। তিনি আমেরিকার মেসাচুসেটস এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন কিন্তু ডিগ্রি অর্জন না করেই AT & T কোম্পানিতে পরিসংখ্যানবিদ হিসাবে যোগদান করেন। ১৯২৭ সালে তিনি '' নিউজার্সি বেল টেলিফোন কোম্পানি'' তে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। ফলপ্রসূ প্রশাসন সম্পর্কে তার পর্যবেক্ষণ একটি বইয়ে লিপিবদ্ধ করেন। বইটির নামহলো "The Function of the Executive" । এটি ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়।চেষ্টার আই বার্নার্ড"Acceptance theory of authority" এর জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। এখানে তিনি বলেন, ''কর্তৃত্ব শুধু যিনি নির্দেশ দেবেন তার উপর নির্ভর করে না, বরং এটি নির্দেশ গ্রহণকারীর উপরও নির্ভর করে''।

(খ) হুগো মনস্টারবাগ (১৮৬৩-১৯১৬) Hugo Monsterberg (1863-1916): হুগো মনস্টারবার্গ জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই পড়াশুনা করেন। তিনি একই সাথে চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন ও মনোবিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৮৯২ সালে হার্ভার্ডে একটি মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত ল্যাবরেটরি (Psychological Laboratory) স্থাপন করেন এবং মনোবিজ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার প্রয়াস চালান। মনোবিজ্ঞানকে শিল্পে ব্যবহার করার জন্য তাঁর আগ্রহ অনেক আগে থেকেই। এ বিষয়ে তিনি একটি পুস্তক রচনা করেন, যার নাম 'Psychology an Industrial Efficiency' ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি যুক্তি দেন যে, মনোবিজ্ঞান তিনটি উপায়ে শিল্পকে সাহায্য করতে পারে। প্রথমত: এটি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। মনোবিজ্ঞান কাজ সম্পর্কে গবেষণা করতে পারে এবং এ জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত লোক কীভাবে বাছাই করতে হবে তা বলে দিতে পারে। দ্বিতীয়ত: মনোবিজ্ঞান সুষ্ঠু কার্যপরিবেশ চিহ্নিত করতে পারে যেখানে কর্মী সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে। তৃতীয়তঃ কর্মীদেরকে এমনভাবে প্রভাবিত করা যেন তাদের দ্বারা

ব্যবস্থাপনার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। তিনি শিল্প মনোবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং সফল হন। এ জন্য তাঁকে ‘‘ শিল্প মনোবিজ্ঞানের পিতা’’ (The Father of Industrial Psychology) বলা হয়।

(গ) মেরি পার্কার ফলেট (১৮৬৮-১৯৩৩)Mary parker Follett (1868-1933): মেরি পার্কার ফলেট আমেরিকার বোস্টনে জন্মগ্রহণ করেন এবং রেডক্লিন কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়াশুনা করেন। তিনি একজন সামাজিক কর্মী ছিলেন এবং তাঁর আগ্রহ ছিল চাকরি ও কার্যক্ষেত্রসংক্রান্ত। তিনি সংগঠনে দলগতভাবে কার্যসম্পাদনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, কর্মীরা সংগঠনে সর্বদা দল দ্বারা প্রভাবিত হয়। দলেরই ক্ষমতা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার। মেরি পার্কার ফলেট বিশ্বাস করতেন যে, সংগঠনে “Power with rather than power over” নীতির অধীনে কাজ করা উচিৎ। এর অর্থ– ক্ষমতা হলো প্রভাবিত করার ও পরিবর্তন আনার সাধারণ ক্ষমতার কর্মীর ও ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে, সহযোগিতার ভিত্তিতে ক্ষমতার উন্নয়ন; সাংগঠনিক স্তরের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ক্ষমতার বলে; জোরপূর্বক নয়। তিনি সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্ব নিরসনের পরামর্শ দেন।

(ঘ) ম্যাককিনসের সপ্ত-এস অ্যাপ্রোচThe Mckinsey’s Seven-s Approach: ম্যাককিনস এ্যান্ড কোম্পানি” - একটি ব্যবস্থাপনা পরামর্শদানকারী সংস্থা। এ সংস্থা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাতটি - এস (Seven-s) উদ্ভাবন করে, যা পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ অ্যাপ্রোচের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে “The Art of Japanese Management” ও “In Search of Excellence” এর উপর গবেষণা কার্য পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে এ দুটি গবেষণা বই আকারে প্রকাশিত হয়। এটি জনপ্রিয়তা অর্জনের আর একটি কারণ হলো -তৎকালীন হার্ভাড ও স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ‘বিজনেস স্কুল’ (Business School) বিভিন্ন গবেষণায় সপ্ত-এস (Seven-S) অ্যাপ্রোচটি ব্যবহার করেছে। ম্যাককিনস এর সপ্ত-এস নিম্নরূপ:

১। **স্ট্রাটেজি** (Strategy): এর অর্থ হলো - কোম্পানির লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদের যথাযথ বণ্টন ও পদ্ধতিগত কার্যক্রম।

২। **কাঠামো** (Structure): কাঠামো বলতে সংগঠন কাঠামো এবং কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে সম্পর্ককে বুঝায়।

৩। **পদ্ধতিসমূহ (System):** কার্যসম্পাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসমূহকে বুঝায়, যার মধ্যে রয়েছে– তথ্য ব্যবস্থা, উৎপাদন প্রক্রিয়া, বাজেটিং ও নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়া।

৪। **স্টাইল** (Style): স্টাইল হলো এমন এক পন্থা যাতে উল্লেখ করা হয় যে, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা কী ধরনের আচরণ করবে এবং সম্মিলিতভাবে তারা কীভাবে সময় ব্যয় করবে।

৫। **স্টাফ** (Staff) **:** প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীগণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে তাদেরকে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া।

৬। **পারস্পরিক মূল্যবোধ** (Shared value) **:** প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল স্তরের কর্মীগণের মধ্যে মূল্যবোধ বিনিময় করবে এবং তাদের মধ্যে মূল্যবোধের জাগরণ ঘটাতে হবে।

৭। **দক্ষতাসমূহ** (Skills) **:** দক্ষতা বলতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্মক্ষমতা বা যোগ্যতা বুঝানো হয়েছে। এটি অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেকে আলাদা করার যোগ্যতাকে বোঝানো হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লিখিত সপ্ত-এস পারস্পরিকভাবে আবদ্ধ অর্থাৎ, আন্ত:সম্পর্কিত; ফলে এটি ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা যথাস্থানে বৃদ্ধি করেছে। এতে প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সপ্ত-এস কার্যকারিতায় শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক স্যেহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য অতীব জরুরি।

(ঙ) হেনরি মিনসবার্গ Henri Minzbrg’s: অধ্যাপক হেনরি মিনসবার্গ কানাডায় অবস্থিত ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি ব্যবস্থাপনা ভূমিকা অ্যাপ্রোচ আবিষ্কার করেন। এটি সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবিত বিভিন্ন মতবাদসমূহের মধ্যে অন্যতম। তিনি মনে করেন যে, ব্যবস্থাপকগণ যে সকল কার্যসম্পাদন করেন তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। অর্থাৎ, ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক সম্পাদিত সাধারণ কার্যক্রমই ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা

নির্ধারণ করে দেবে।অধ্যাপক মিনসবার্গ বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫ (পাঁচ) জন প্রধান নির্বাহীর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখেন যে, তাদের গতানুগতিক কার্যাবলি যেমন:পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয়সাধন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কার্যক্রমের পরিবর্তে অন্যান্য নানাবিধ কার্যক্রমে বেশি নিয়োজিত থাকে। অন্যান্য কার্যাবলির মধ্যে নীচে উল্লিখিত কার্যক্রমই প্রধান।

(ক) আন্ত:ব্যক্তিক ভূমিকা (Inter-Personal Roles**)**
১। নামমাত্র প্রধানের ভূমিকা (The figure head role)
২। নেতার ভূমিকা (The Leader role)
৩। জনসংযোগের ভূমিকা (The Liaison role)

(খ) তথ্যসংক্রান্ত ভূমিকা (Informational role**)**
১। প্রাপকের ভূমিকা (The recipient role)
২। প্রচারকের ভূমিকা (The disseminator's role)
৩। মুখপাত্রের ভূমিকা (The spokesperson role)

(গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা (Decision Roles**)**
১। উদ্যোক্তার ভূমিকা (Entrepreneurial role)
২। সমস্যা মোকাবিলাকারীর ভূমিকা (The disturbance handler role)
৩। সম্পদ বণ্টনকারীর ভূমিকা (The resource allocator role)
৪। মধ্যস্থকারীর ভূমিকা (The negotiator role)

সমালোচনা:
Criticism

মিনসবার্গ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থাপনা ভূমিকা মতবাদের উপর পরিচালিত গবেষণার কিছু সমালোচনাও রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ-

১। এটি অল্প কয়জন প্রধান নির্বাহীর উপর গবেষণা চালিয়ে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
২। ব্যবস্থাপকগণ এমন অনেক কাজ করেন যা ব্যবস্থাপনা নয়। যেমন: গণসংযোগ, প্রচারণা প্রভৃতি।
৩। মিনসবার্গ ব্যবস্থাপকদের যে সকল কার্যাবলির কথা বলেছেন, সেগুলো ব্যবস্থাপনার সাধারণ কার্যাবলির বাইরে নয়।
৪। মিনসবার্গ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন, তা অসম্পূর্ণ। যেমন - সেখানে ব্যবস্থাপনার কাঠামো নির্ধারণ, ব্যবস্থাপকদের নির্বাচন, কার্যসম্পাদনের স্ট্রাটেজি নির্ধারণ প্রভৃতি স্থান পায়নি।

পরিশেষে বলা যায় যে, যদিও মিনসবার্গের উদ্ভাবিত অ্যাপ্রোচের সমালোচনা করা হয়েছে, তথাপি এটি ব্যবস্থাপকদের কার্যসম্পাদন ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ।

উৎকর্ষতার গুণাবলি বা নির্ধারক অ্যাপ্রোচ
The Attributes of Excellence

টমাস জে. পিটার্স ও রবার্ট এইচ, ওয়াটারম্যান জুনিয়র এর গবেষণার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকদের এমন কিছু ''গুণাবলি'' (Attributes) উদ্ভাবন করেছেন যা ব্যবস্থাপকদের কার্যে উৎকর্ষতা অর্জনের সহায়ক। এ সকল গুণাবলি বা নির্ণায়কসমূহ প্রয়োগ করে ব্যবস্থাপকগণ তাদের কাজে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য এগুলোকে একত্রে '' উৎকর্ষতার গুণাবলী বা নির্ণায়ক অ্যাপ্রোচ'' বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৮২ সালে টমাস জে. পিটার্স ও রবার্ট এইচ. ওয়াটারম্যান জুনিয়র ''In Search of Excellence'' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন এবং পুস্তকে উৎকর্ষতার নির্ণায়ক বা গুণাবলি অ্যাপ্রোচটি বিধৃত করেন। তারা তাতে বলার প্রয়াস পান যে, আমেরিকার নামিদামি কোম্পানিগুলো কীভাবে সফলতা লাভে সক্ষম হয়েছে।

অলিভার শেলডন (Oliver Shelldon): ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে অবদানকারী অলিভার শেলডন ১৮৯৪ সালে ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে সামরিক বাহিনীর চাকরিতে যোগদান করেন। চাকরিতে যোগদানের পর তিনি ইংল্যান্ডের নিউইয়র্কে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং বাকি জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। সেখানেই তিনি ব্যবস্থাপনার উপর কাজ করেন। সেখানে তিনি বাউন্ট্রি এন্ড কোম্পানি লিমিটেডের ককা ওয়ার্কস - এ কাজ করেন। সেখানে তিনি বি.এস বাউন্ট্রির ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি বোর্ড অব ডিরেক্টর এর ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। সেখানে চাকরিরত অবস্থায় ব্যবস্থাপনার উপর কতকগুলো মতবাদ প্রবর্তন করেন যা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং তার সুনাম বৃদ্ধি পায়। তাঁর রচিত "The Philophy of Management" পুস্তকটি ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকে তিনি ব্যবস্থাপনার কাজকে তিনভাগে ভাগ করেন যা, নিম্নরূপ:-

(i) প্রশাসনিক: প্রশাসনের কাজ হলো নীতি নির্ধারণ করা এবং বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন বা সামঞ্জস্য বিধান করা।
(ii) ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি :- ব্যবস্থাপনার কার্যাবলিকে বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগে ভাগ করত: যোগ্যতানুযায়ী কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া।
(iii) নির্দেশনা ও কার্য বাস্তবায়ন: অর্পিত ব্যবস্থাপনার কার্যসমূহ নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা।

সামাজিক দায়িত্ব:

(i) তিনি ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্বের কথা বলেছেন।
(ii) তিনি শ্রমিক-কর্মীদের উন্নয়নের দিকে নজর দিতে বলেছেন এবং তাদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন, ক্লাব, জনহিতকর ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি করার সুযোগ দিতে বলেছেন। এতে কার্যপরিবেশ উন্নত হয়।

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:

অলিভার শেলডনের মতে একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিম্নরূপ হওয়া আবশ্যক:

(i) সংগঠন কাঠামো সঠিকভাবে প্রনয়ন করতে হবে, যাতে সহজভাবে কার্যসম্পাদন করা সম্ভব হয়।
(ii) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পণ্যের গুনগত মানোন্নয়ের সুযোগ থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিয়মনীতি প্রণয়ন করতে হবে।
(iii) প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় যেন সমাজের আদর্শ প্রতিফলিত হয়।
(iv) ব্যবস্থাপনায় তিনটি অংশ থাকবে, যেমন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন।
(v) উত্তম জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী উপাদন করতে হবে।
(vi) ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ভিত্তি জোরদার করতে হবে।
(vii) ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের ব্যবহার ও মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
(viii) শ্রমিকদের সমিতিগুলোকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, এগুলো যেন সমাজের জন্য ক্ষতিকর না হয়।
(ix) জনশক্তি ও উপকরণসমূহ মিতব্যয়িতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।
(x) ব্যবস্থাপনার কাজ চারভাগে বিভক্ত:
(ক) নকশা যন্ত্রপাতি উন্নয়ন
(খ) নির্মাণ কাজ
(গ) নির্মাণ কাজের সহায়ক কার্য; যেমন: পরিবহণ, পরিকল্পনা, তুলনাকরণ ও শ্রম।
(ঘ) পণ্য বিতরণসংক্রান্ত কাজ; যেমন: বিক্রয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি।

এলটন মেয়ো ও হর্থন গবেষণা

Elton Meyo & Hawthorne Study

গবেষণার স্থান: হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এলটন মেয়ো অস্ট্রেলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মনোবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি সামাজিক উপাদান এবং শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেন। **১৯২৭** সাল থেকে **১৯৪৭** সাল পর্যন্ত মেয়ো হার্ভার্ডে শিল্প গবেষণা বিভাগে পরীক্ষানিরীক্ষা পরিচালনা করেন। এই কর্মসূচিটি ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানির হর্থন কারখানায় অনুসন্ধানের ফলে শুরু হয়। এই কর্মসূচি রকফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূলে তারতম্যমূলক পরিস্থিতিতে একটা গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদনের উপর আলোর প্রভাব কীরূপ তা এ ক্ষেত্রে গবেষণা করা হয়। ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল এই গবেষণা কার্যে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পরীক্ষামূলক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যখন আলো বৃদ্ধি করা হয় তখন উৎপাদনও বেড়ে যায় এবং অনুরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত দলের বেলায় আলো বৃদ্ধি না করা সত্ত্বেও উৎপাদন বাড়তে থাকে। তাদের জন্য আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আলো হ্রাস করা সত্ত্বেও উভয় দলের উৎপাদন বাড়তে থাকে। এমনকি পরীক্ষিত দলের বেলায় আলোর পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাস করা হলেও উৎপাদন একই রকমভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ছয়টি মেয়ের একটা দল **১৯২৭** সালে দ্রব্য প্রস্তুত করার বিশেষ এক পেশা জীবনবৃত্তি হিসাবে বেছে নেয়। তাদের কারখানায় উৎপাদনের উপর প্রভাব পরীক্ষার জন্য কর্মপরিবেশের কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনগুলো ছিল বিভিন্ন সময় ও মেয়াদভিত্তিক অবসর, সংক্ষিপ্ত কর্মসপ্তাহ, সকালে নাস্তা খাওয়ার অবসরে কফি বা স্যুপ ইত্যাদি প্রদান। প্রতিটি পরিবর্তনের ফলাফল ছিল সংগতিপূর্ণ। এতে উৎপাদন বেড়ে যায় এবং একই সঙ্গে মেয়েরা কম ক্লান্তিবোধ করে। এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এলটন মেয়ো শিল্প-শ্রমিক সম্পর্কের উপর প্রভাবকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

ফলাফল: তার ধারণা হলো, কর্মীর আচরণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সকল উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সামাজিক দলে শ্রমিকের অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট উপাদান। সুতরাং মেয়ো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কর্মী ব্যবস্থাপনা উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন ছাড়াও কর্মস্থলে কর্মীদের সামাজিক সন্তুষ্টি বিধানের মনোচাহিদাও অবশ্যই পূরণ করা। মানবসম্পর্কের উপর এই নতুন গুরুত্বারোপের ফলে কারখানা অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছাড়াও এক সামাজিক গুরুত্ব অর্জন করে। The human problems of an industrial civilization নামক গ্রন্থে বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থ **১৯৩৩** সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

উপসংহার: এলটন মেয়ো ও তার সহকর্মীগণ বিশ বছর ধরে কারখানার পরিবেশ নিয়ে যে গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন, তা ছিল একদল শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবচেয়ে ব্যাপক গবেষণা। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, কারখানায় শ্রমিকগণ এক ধরনের সংহতি বা পরিবেশ গড়ে তোলে, যা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা যায়। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করতে হলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সম্পাদিত কাজ একদিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদের সামাজিক সন্তুষ্টিবিধান করবে, অন্যদিকে কোম্পানির উৎপাদন চাহিদাও পূরণ করবে। এইভাবে কর্মীর ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করে এলটন মেয়ো বলেন যে, কর্মীর সঙ্গে আচরণ করার জন্য ব্যবস্থাপনাকে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। একে অবশ্যই নতুন কর্তৃত্বের ধারণা এবং আদেশ করার অধিকার অর্জন করতে হবে এবং অবশ্যই ব্যক্তির সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমন্বিত সংগঠন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে নতুন সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

উইলিয়াম ওচি - এর `Z' তত্ত্ব:

William Ouchi's Theory `Z'

উইলিয়াম ওচি একজন বিখ্যাত ব্যবস্থাপনা বিশারদ। তিনি জাপানে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি মার্কিন নাগরিক। তিনি আমেরিকার ব্যবস্থাপনা ও জাপানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সমন্বয়ে যে নতুন ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন, তাকে Z তত্ত্ব বলে। এটি উভয় দেশের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ভালো দিকগুলোর সংমিশ্রণে উদ্ভাবিত। প্রেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কারণ জাপানি ব্যবস্থাপনা মার্কিন ব্যবস্থাপনার তুলনায় অধিক সফল। তত্ত্বের মূল বিষয় হলো অংশগ্রহণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বাস্তবায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান প্রভৃতি কাজে শ্রমিক-কর্মীগণ অংশগ্রহণ করে। জাপানে ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদেরকে একটি দল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এতে তাদের মধ্যে প্রেষণার উন্নয়ন ঘটে অর্থাৎ তারা প্রণোদিত হয়। আমেরিকা ও জাপানের এ তত্ত্ব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নীচে মার্কিন ও জাপানি ব্যবস্থাপনায় সংমিশ্রণ দেখানো হলো:

তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১। সারা জীবনব্যাপী কর্মসংস্থান।
২। ঐকমত্যের ভিত্তিতে যৌথ সিদ্ধান্ত।
৩। ব্যক্তিক দায়িত্ব পালন।
৪। কর্মীদের কার্যাবলি যত্নসহকারে মূল্যায়ন ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা যেন প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের আস্থা বেড়ে যায়।
৫। আত্মতৃপ্তির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

মার্কিন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপাদান সমূহ `Type-A	Z - তত্ত্ব (Theory – Z)	জাপানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপাদানসমূহ Type - J
• স্বল্প মেয়াদি চাকরি	• দীর্ঘমেয়াদি চাকরি	• আজীবন চাকরি
• ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব পালন	• ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব গ্রহণ	• যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ
• ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত	• সকলের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	• সকলের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
• দ্রুত মূল্যায়ন ও পদোন্নতি	• বিলম্বিত মূল্যায়ন ও পদোন্নতি	• বিলম্বিত মূল্যায়ন ও পদোন্নতি
• বিভাজিত দৃষ্টিভঙ্গি	• সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি	• সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি
• ব্যক্তিক উন্নয়নের জন্য বিশেষায়িত পথ	• ব্যক্তিক উন্নয়নের জন্য গ্রহণীয় মাত্রায় বিশেষীকরণ	• ব্যক্তি উন্নয়নের জন্য অবিশেষায়িত পথ
• আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	• স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণের সাথে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা	• স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ

Prof. R.W. Griffin বলেন,"Z মডেল হলো জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের একই ধরনের ব্যবসায় কৌশলকে একটি মধ্যপন্থি কাঠামোতে সমন্বিত করার প্রয়াস।"(The type Z model is an attempt to integrate common business practices from the United States and Japan into one middle ground framework.)

Bartol & Martin বলেন, "Z তত্ত্ব হলো এমন একটি মতবাদ যা মার্কিন ও জাপানি ব্যবস্থাপনার ভালো দিকগুলোর সমন্বয়ে একটি সংশোধিত দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করে। এর উদ্দেশ্য হলো আমেরিকার সমাজের কৃষ্টি ও মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রেখে সে দেশের ব্যবস্থাপনা কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।: (The Z-theory is a concept that creates positive aspects of American and Japanese management is amodified approach aimed at increasing US managerial effectiveness while remaining compatible with the horms and values of American society and cutlture)

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ ব্যবস্থাপনা দর্শন, ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্ম সম্পর্কে খাতায় বিবরণ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ব্যবস্থাপনার আত্মপরিচয় পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, মানব সভ্যতা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্রমবিকাশ ও সম্প্রসারণের সাথে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নেরও একটি যোগসূত্র রয়েছে। সভ্যতার যেমন বিকাশ ঘটেছে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পেরও তেমন বিকাশ ঘটেছে। এতে বিভিন্ন মনীষীগণ, চিন্তাবিদ, গবেষক ও শিল্প উদ্যোক্তাগণ ব্যবস্থাপনা দর্শন উন্নয়ন করার জন্য ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছেন। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদের ধারণা, চিন্তা ভাবনা সময়ের বিবর্তনে ব্যবস্থাপনা দর্শন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং বলা যায় যে, যে সকল জ্ঞান ও ধারণা লাভ করলে একজন ব্যবস্থাপক যাবতীয় ব্যবস্থাপনা কার্য সফলতার সাথে সম্পাদন করতে পারেন তাকে ব্যবস্থাপনা দর্শন বলা হয়। ব্যবস্থাপনা দর্শনের উপর প্রভাববিস্তারকারী বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। এগুলো হলো- সমাজ, শিক্ষা, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সরকার, আইনগত পরিবেশ, জনসংখ্যা প্রভৃতি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষী ব্যবস্থাপনার ধারণা দিয়েছেন। (ক) প্রাক ধ্রুপদী সময়ের অবদানকারীগণ হলেন রবার্ট ওয়েল, চার্লজ ব্যাবেজ ও হেনরি আর, টাউনি প্রমুখ। (খ) ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গির মনীষীগণ হলেন- এফ.ডব্লিউ টেলর, হেনরি এল. গ্যান্ট, ফ্রাঙ্ক ও লিলিয়ান গ্রিলব্রেথও হেনরি ফেয়েল প্রমুখ। (গ) নব্য-ধ্রুপদী মতবাদের অনুসারীগণ হলেন- চেস্টার আই বার্নাড, হুগো মনস্টারবার্গ, মেরি পার্কার ফলেট, ম্যাককিনসের সপ্ত-এস অ্যাপ্রোচ, হেনরি মিনসবার্গ, এলটন মেয়োও উইলিয়াম ওচি প্রমুখ।

পাঠ-১.৭

শিল্পবিপ্লব কী?; শিল্পবিপ্লবের কারণ; এ সময়ে বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন

What is meant by Industrial Revolution; Causes of Industrial Revolution, Various Development During Industrial Revolution

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- শিল্পবিপ্লব সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- শিল্পবিপ্লবের কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিল্পবিপ্লবের সময়ে বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

শিল্পবিপ্লব বলতে কী বুঝায়?

What is meant by Industrial Revolution?

আন্দোলনের মাধ্যমে কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনয়নকে বিপ্লব বলে। শিল্প, সমাজ, দেশ, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। যদি এ পরিবর্তন দ্রুততার সাথে ঘটে, তবে তাকে বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়। শিল্পক্ষেত্রে অনুকূল আন্দোলনের মাধ্যমে শিল্পের আমূল পরিবর্তনের দ্বারা পুরাতন ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে নতুন ব্যবস্থা চালু করা হলে তাকে শিল্পবিপ্লব বলে। ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তা পর্যায়ক্রমে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে শিল্পক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য ব্রিটেনে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই এ যুগকে শিল্পবিপ্লবের যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। ১৮শতকের শেষ এবং ১৯ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডে এ বিপ্লব সংঘটিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন, উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত পরিবর্তন এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী গবেষক আরনল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee) তার ''Lectures on the Industrial Revolution'' গ্রন্থে সর্বপ্রথম শিল্পবিপ্লবের ধারণাকে জনসমক্ষে উপস্থাপন করেন। টি, এস, এসটন (T S Eston) এর মতে ''An affairs of economics and technology in industrial revolution'' অর্থাৎ অর্থনীতি ও প্রযুক্তির বিষয়সমূহের ফলশ্রুতিই হলো শিল্পবিপ্লব। শিল্পবিপ্লব উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করে। ফলে ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এ সময় বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সুতরাং শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ সময় নতুন যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়। শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ে ব্রিটেনে অধিকাংশ মানুষ ছোট্ট গ্রামে বাস করতো। তারা পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে চলাচল করতো। অপর্যাপ্ত খাদ্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দূষিত পানির ব্যবহার, পয়ঃনিস্কাশনের অভাব এবং রোগ-ব্যাধি ছিল তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। এ কারণে তাদের গড় আয়ু ছিল খুবই কম। তাদের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ কৃষিকাজ করতো। বাকি ২০ ভাগ মানুষ ছোট শহরে বাস করতো। গ্রামবাসীরা সকাল-সন্ধ্যা কাজ করতো। খুব অল্প সংখ্যক লোক উৎপাদন, খনি ও ব্যবসায়ে কাজ করতো। শিল্পোৎপাদন ছিল হাত দিয়ে চালিত যন্ত্র ও স্থানীয় প্রযুক্তি নির্ভর। স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে শিল্পোৎপাদনে পরিবর্তন সাধিত হয়। ইতিহাসে এ উদ্ভাবনকে পরিবেশগত ইঞ্জিন (atmostpheric engine) হিসাবে বিবেচনা করা হতো। পরবর্তীকালে স্কটিশ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার জেমস ওয়াট (James Watt) ১৭৭৬ সালে এটির উন্নয়ন সাধন করেন। এ আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী আধুনিক শিল্প যুগের সূচনা করেছিল। এ সময়ে এমন কিছু বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যারা মূলত ব্যবস্থাপনার বিশেষজ্ঞ নয় কিন্তু ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তারা হলেন– স্যার জেমস্ স্টিওয়ার্ট, অ্যাডাম স্মিথ, রিচার্ড আর্করাইট, জেমস্ ওয়াট, জেমস মিল, রবিনসন বোল্টন, রবার্ট ওয়েন প্রমুখ। সুতরাং দেখা যায় যে, এ সময় বিপ্লবের দ্বারা শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, যে বিপ্লবের মাধ্যমে উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণ ও নবজাগরণ সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে শিল্পবিপ্লব বলে।

শিল্পবিপ্লবের কারণ

Causes of Industrial Revolution

১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সময়কালের মধ্যে ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব সংগঠিত হয়। ফলশ্রুতিতে, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সূচিত হয়। আর এ বিপ্লবের কথা সর্বপ্রথম ফরাসি লেখকগণ উনবিংশ শতাব্দীতে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। বিশেষ করে বিখ্যাত লেখক Arnold Toynbee তাঁর "Lectures on the Industrial Revolution" প্রবন্ধে ধারণাটি প্রকাশ করেন। যাহোক, শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। এ কারণগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যেমন: (ক) অর্থনৈতিক কারণ (খ) রাজনৈতিক কারণ ও (গ) সামাজিক কারণ। নীচে এগুলো বর্ণনা করা হলো :

(ক) অর্থনৈতিক কারণ: শিল্পবিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণগুলো নিম্নরূপ:

১। **কৃষি আন্দোলন:** শিল্পবিপ্লবের সময়ে কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্রিটেনে ব্যাপক আন্দোলন হয়। এতে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষি থেকে প্রাপ্ত উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়।

২। **নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার:** ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে অনেক নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়। এ গুলো শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়।

৩। **মূলধনের প্রাচুর্য:** শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এতে বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থের আগমন ঘটে যা শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অধিক পরিমাণে মুনাফাও অর্জিত হয়, যা শিল্পের বিনিয়োগকে আরও ত্বরান্বিত করে।

৪। **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব:**শিল্পবিপ্লব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর প্রভাব ফেলে। ফলে ব্রিটেনে নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও প্রযুক্তির প্রভাবে বাষ্পীয় ইঞ্জিন শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে। এ সময়ে তাঁরা প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়।

৫। **পরিবহণ:** উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের পাশাপাশি পরিবহন ব্যবস্থা ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়েছিল; যা উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম করে তোলে। এতে কৃষিপণ্যকে শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

৬। **পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ:** শিল্পায়নের প্রথম শর্তই হলো প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ততা। ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব সংগঠিত হওয়ার শুরুতেই পর্যাপ্ত প্রকৃতিক সম্পদ ছিল, যা শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন: লৌহ, কয়লা ও লোম প্রভৃতি। ফলে এগুলোকে কাজে লাগাবার জন্য বিভিন্ন যন্ত্র ও মেশিনারিজ আবিষ্কার করা হয়।

৭। **বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ:** শিল্পবিপ্লবের সময় হতে ব্রিটেনে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য তাঁরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, কৃত্রিম খাল খনন, সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি। ফলে দেশ উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে যায়।

(খ) সামাজিক কারণ: শিল্পবিপ্লবের সামাজিক কারণগুলো নিম্নরূপ:

১। **জনসংখ্যা বৃদ্ধি:** শিল্পবিপ্লবের সময়টাতে ব্রিটেনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এতে তাদের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন হয়। এ প্রয়োজন থেকেই বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে তাঁরা সফল হয়।

২। **দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ:** শিল্পবিপ্লবের সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা ও কোন্দল দেখা দেয়। ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক ব্রিটেনে আগমন করে এবং তারা বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত হয় এবং দক্ষতার সাথে কাজ করতে সক্ষম হয়। তারাই উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু করে। ফলে উৎপাদন বেড়ে যায়।

৩। **নমনীয় সমাজ ব্যবস্থা:** ব্রিটেনের সমাজ ব্যবস্থা ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় নমনীয় ও কুসংস্কারমুক্ত ছিল। তাই এখানে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ছিল না। ফলে এখানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্ভব হয়।

৪। **বিশ্ব রাজনৈতিক কর্তৃত্ব:** অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্রিটেনই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র। ব্রিটেন সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতো। বলা হতো-ব্রিটেনে সূর্যাস্ত হয় না। তাই ব্রিটেনের পক্ষে বিশ্ববাণিজ্য সম্প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। এটি শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

(গ) রাজনৈতিক কারণ: শিল্পবিপ্লবের রাজনৈতিক কারণগুলো নিম্নরূপ:

(১) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা: রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যে-কোনো দেশের উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক। ব্রিটেনে ১৬৮৮ সালের পর হতে স্থিতিশীল ও সুসংহত শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়। এতে দেশটিতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে। এটি শিল্পবিপ্লবের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

২। **ব্যক্তি মালিকানাধীনকরণের সুযোগ:** ব্রিটেনে বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুযোগ থাকার কারণে বহু উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে এবং বেসরকারি খাতে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। এ কারণেও শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে।

৩। **মানসিক পরিবর্তন:** যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের মানসিক ধ্যানধারণা শিল্পবিপ্লবের পক্ষে ছিল। এটি শিল্পবিপ্লবের একটি সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত না হলেও ব্রিটেনে সংঘটিত হয়েছিল বিভিন্ন কারণে। এ কারণগুলোর মধ্যে উপর্যুক্ত কারণগুলো অন্যতম।

শিল্পবিপ্লবের সময়ে বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন

Various Development During Industrial Revolution

শিল্পবিপ্লবের সময়ে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে। সে সময় বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সাধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ - লোহা তৈরির মেশিন, সুতা ও কাপড় তৈরির যন্ত্র, জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রভৃতি। এ গুলো সমগ্র উৎপাদনশীলতার উপাদানের উন্নয়ন সাধন করেছিল। এ সময় ব্রিটেন ''পৃথিবীর ওয়ার্কশপ'' (Workshop of the world) - এ পরিণত হয়। নীচে শিল্পবিপ্লবের সময় বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের বিবরণ দেওয়া হলো:

১। **বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন:** শিল্পবিপ্লবের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে বস্ত্রখাতে। তাই এটিকে শিল্পবিপ্লবের হৃদয় (Heart) বলা হয়। ১৭৭০ হতে ১৮৭০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে সুতি বস্ত্র শিল্প বিস্তার লাভ করে। ব্রিটেনের বস্ত্র শিল্প পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করে, বিশেষ করে ব্রিটেনের কলোনী রাষ্ট্রগুলোতে। শিল্পক্ষেত্রে এ পরিবর্তন ব্রিটেনের সমাজকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। জন কে (John Kay) ১৭৪৭ সালে এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন যা খুব দ্রুত সূতা বুনন করতে পারতো। এ ক্ষেত্রে আরও অবদান রেখেছেন-জেমস হারগ্রেভস (James Hargreaves), স্যামুয়েল ক্রম্পটন (Samuel Crompton) প্রমুখ। ১৮২০ সালে ব্রিটেনে পাওয়ার লুমস (Power Looms) এর সংখ্যা ছিল ১২১৫০টি যা ১৮২৯ সালে বেড়ে হয় ৪৫,৫০০ টি । ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ সংখ্যা ছাড়ায় ৮,০০,০০০-এ এবং সেখানে ১৫,০০,০০০ লোক কাজ করতো। এগুলো ছিল পশমি বস্ত্র। সে সময় পৃথিবীর বস্ত্রখাত নিয়ন্ত্রণ করতো ব্রিটেন।

২। **লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়ন:** শিল্পবিপ্লবের সময় আশ্চর্যজনকভাবে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়ন সাধিত হয়। ১৭৫০ সালে ব্রিটেনে মাত্র ২৮,০০০ টন লৌহ উৎপাদিত হতো, যা ১৮০৫ সাল নাগাদ ২,৫০,০০০ টনে উন্নীত হয়। এ ক্ষেত্রে যারা অবদান রাখেন তাঁরা হলেন- ১৭০৯ সালে Abraham Darby, ১৭৮৪ সালে Henry Cort, ১৮২৮ সালে James Beaumont, ১৮৫৫ সালে Henry Bessemer প্রমুখ। তারা লৌহ উৎপাদনের বিভিন্ন কৌশল ও পন্থা উদ্ভাবন করেন, যা এ শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায় বহুদূর।

৩। **ক্যামিকেল উৎপাদনে উন্নয়ন:** শিল্পবিপ্লবের সময় বিভিন্ন ধরনের কেমিকেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতে থাকে, যেমন: সালফিউরিক এসিড, এ্যালকালি, সোডিয়াম কার্বোনেট, সোডিয়াম সালফেট, পটাশ, ব্লিচিং পাউডার, কংক্রিট প্রভৃতি। এ সকল কেমিক্যাল, বস্ত্র, কাপড়, পরিস্কারকরণ এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতো। এ ক্ষেত্রে অবদানকারীগণ হলেন- John Roebuck, Nicolas Leblanc, Charles Temant, Joseph Aspdin, William Merdoch প্রমুখ। তাঁরা বিভিন্ন ক্যামিকেল ও এর ব্যবহার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

৪। **জনসংখ্যা বৃদ্ধি:** ১০,০০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ০.০১ ভাগ। ১৭ শতকে শতকরা প্রায় ১.৫ ভাগ সন্তান মারা যেত মায়ের মৃত্যুর কারণে। ১৯ শতকে এ অবস্থার অবসান হয়। শিল্পবিপ্লবের সময় শিশুমৃত্যুর হার কমে যায় এবং জন্মহার বেড়ে যায়। কারণ, এ সময় চিকিৎসাবিদ্যা, সেনিটারি সিস্টেম ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে। জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনের সাথে সাথে নাটকীয়ভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। ইংল্যান্ডে ১৭৯১ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধি ছিল শতকরা ১.৩৬ ভাগ। ১৮২০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধি ছিল শতকরা ১৬৬ ভাগ। যাহোক শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীকালে ব্রিটেনসহ ইউরোপের সকল দেশেই জনসংখ্যার হার বাড়তে থাকে। কারণ মানুষের অর্থনৈতিক, অবস্থার উন্নয়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অগ্রসর হওয়ার কারণেই এমনটি হয়েছিল।

৫। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** ১২৫০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের অর্থনীতি ছিল ক্ষীণ আলো প্রদানকারী বাতির মতই স্বল্পোন্নত। শিল্পবিপ্লবের সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি প্রায় ২২ গুণ বৃদ্ধি পায়। সে সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং সিস্টেমে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। তবে এ সময় ধনিকশ্রেণি আরও ধনী হয় এবং অধিকাংশ জনগণই সমাজের নিম্নস্তরে থেকে যায়। ১৮ শতকে ব্রিটেনের অর্থনীতি সফল অর্থনীতিতে পরিণত হয়। সে সময় ব্যবসায়ী ও জমির মালিকদের মধ্যে শক্তিশালী কোয়ালিশন গড়ে ওঠে যাতে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সম্পদ রক্ষা করা যায়। শিল্পবিপ্লবের সময় হতেই ব্রিটেনের অর্থনীতি চাঙ্গা হতে থাকে। সেই সাথে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এর ছোঁয়া লাগে।

৬। **কৃষি বিপ্লব:** অধিক জমির মালিকগণ ক্ষুদ্র চাষীদের জমি কিনে নেয় এবং বেড়া দিয়ে আটকিয়ে বড় আকারের মাঠ তৈরি করে চাষাবাদ শুরু করে। ধনী জমির মালিকগণ ক্ষুদ্র চাষীদেরকে জমি বিক্রি করে তাদের অধীনে কাজ করতে অথবা শহরে চলে যেতে বাধ্য করে। ফলে তারা জমির মায়া ত্যাগ করে শহরে গিয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজ করে। সে সময় তারা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে। যেমন- বীজ বপনের যন্ত্র, লোহার তৈরি ইংল্যান্ডের লাঙল, শস্য মাড়াইয়ের যন্ত্র ইত্যাদি। ১৭০১ সালে Jethro Tull নামে এক ব্যক্তি বীজ বপন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি ছিলেন কৃষিবিপ্লবের অগ্রদূত। তিনিই ব্রিটেনে কৃষিতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। এই যন্ত্রটি একসাথে অনেক পরিমাণ জমিতে সঠিক গভীরতায় বীজ বপন করতে সক্ষম। অত:পর Joseph Foljambe ১৭৩০ সালে লোহার লাঙল তৈরি করেন; সফলভাবে যার বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়। ইংরেজ কৃষকরা বেশি শস্য পাওয়ার জন্য উন্নত বীজ ব্যবহার করতো। তাঁরা জমি পতিত না রেখে চাষ করা যায়, এমন শস্য বেশি চাষ করতো। যেমন: গম, শালগম, বার্লি, গবাদি পশুর ঘাস প্রভৃতি। ব্রিটিশ কৃষকদের জমির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রন ছিল। কৃষি শ্রমিকদের উৎপাদন ছিল উল্লেখযোগ্য। গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিপ্লব ঘটিয়েছিল তারা। প্রতিটি গবাদি পশু হতে যেন বেশি মাংস পাওয়া যায় সেভাবেই পশু পালন করতো। সব মিলিয়ে ইংল্যান্ডে কৃষিতে বিপ্লব ঘটেছিল।

৭। **যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন:** শিল্পবিপ্লবের সময় সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়ন হয়েছিল। তাই মানুষ, পশু-পাখিও পণ্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে আনা-নেওয়া করার জন্য যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কারণ যাতায়াত ব্যবস্থাই হলো কোনো দেশের অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিক, সামাজিক ও শিল্পোন্নয়নের মেরুদণ্ড। এ ক্ষেত্রে ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন অল্প জ্বালানি পুড়ে দ্রুত গতিতে চলতে আরম্ভ করলো। এটি প্রথমে মানুষ নৌকায় লোক যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করে। সে সময় ইংল্যান্ডে কাঁচামাল ও তৈরি পণ্য পরিবহণের জন্য প্রাকৃতিক খাল ও মানুষের তৈরি পানিপথ ব্যবহার করা হতো। ১৭০০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে সড়ক পরিবহণের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। তাঁরা পাথর দিয়ে রাস্তা তৈরি করে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন তৈরি করে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি কোম্পানি গঠন করা হয়, যারা সড়ক পথ নির্মাণের কাজ করে। ১৮০০ শতকের শুরুর দিকে ব্রিটিশ প্রকৌশলী John Mc Adam একজন রাস্তা নির্মাণকারী, রাস্তার বেড তৈরিতে

পাথর ব্যবহার করেন। শিল্পবিপ্লবের সময় এ কাজে আরও অনেক নামকরা প্রকৌশলীগণ উন্নত রাস্তা নির্মাণ করেন যেন সহজেই কাঁচামাল ও পণ্য পরিবহণ করা যায়।

৮। **মূলধন সংগ্রহ:** শিল্পবিপ্লবের শুরুতে মূলধন সংগ্রহ করা হয় পরিবার, বন্ধুবান্ধব, আত্নীয়স্বজনের নিকট থেকে। ১৭৭০ সালে লণ্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ গঠন করা হয়। তখন ব্যাংক অব ইংল্যান্ড সরকারের অর্থ সরবরাহ করতো যেন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা যায়। অন্যদিকে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো বৈদেশিক ব্যবসায়ে অর্থ সরবরাহ করে। কারখানার মালিকগণ যারা সফলভাবে কারখানা পরিচালনা করতে পেরেছিল, তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করে। যেমন: খাল, রেলপথ, জাহাজ নির্মাণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি। তারা ইংল্যান্ডের শক্তিশালী শ্রেণিতে পরিণত হয় এবং শিল্প পূঁজিবাদী অর্থনীতির জন্ম দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ শিল্পবিপ্লবের কারণ ও এ সময়ে বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক নিজেদের জ্ঞান যাচাই করে নেবেন।

সারসংক্ষেপ

আন্দোলনের মাধ্যমে কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনয়নকে বিপ্লব বলে। শিল্প, সমাজ, দেশ, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। যদি এ পরিবর্তন দ্রুততার সাথে ঘটে, তবে তাকে বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়। শিল্পক্ষেত্রে অনুকূল আন্দোলনের মাধ্যমে শিল্পের আমূল পরিবর্তনের দ্বারা পুরাতন ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে নতুন ব্যবস্থা চালু করা হলে তাকে শিল্পবিপ্লব বলে। ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তা পর্যায়ক্রমে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে শিল্পক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য ব্রিটেনে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই এ যুগকে শিল্পবিপ্লবের যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। ১৮শতকের শেষ এবং ১৯ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডে এ বিপ্লব সংঘটিত হয়। ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব সংগঠিত হয়। ফলশ্রুতিতে, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সূচিত হয়। আর এ বিপ্লবের কথা সর্বপ্রথম ফরাসী লেখকগণ উনবিংশ শতাব্দিতে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। বিশেষ করে বিখ্যাত লেখক Arnold Toynbee তার ''Lectures on the Industrial Revolution'' প্রবন্ধে ধারণাটি প্রকাশ করেন। যাহোক, শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। এ কারণগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যেমন: (ক) অর্থনৈতিক কারণ (খ) রাজনৈতিক কারণ ও (গ) সামাজিক কারণ। শিল্পবিপ্লবের সময়ে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে। সে সময় বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সাধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ- লোহা তৈরির মেশিন, সূতা ও কাপড় তৈরির যন্ত্র, জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রভৃতি। এ গুলো সমগ্র উৎপাদনশীলতার উপাদানের উন্নয়ন সাধন করেছিল। এ সময় ব্রিটেন ''পৃথিবীর ওয়ার্কশপ'' (Workshop of the world) - এ পরিণত হয়।

পাঠ-১.৮ শিল্পবিপ্লবের ফলাফল; শিল্পবিপ্লব ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে গতিশীলতা সৃষ্টি করেছিল - ব্যাখ্যা

Consequences of Industrial Revolution; "Industrial Revolution Created Dynamism in the Management Development" – Explanation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- শিল্পবিপ্লবের ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- শিল্পবিপ্লব ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে কীভাবে গতিশীলতা সৃষ্টি করেছিল - তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিল্পবিপ্লবের ফলাফল

Consequences of Industrial Revolution

শিল্পবিপ্লব বিশ্বের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে ব্রিটেনের অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির প্রতিটি স্তরে গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবস্থাপনা বিশারদদের মতে, শিল্পবিপ্লবের সময় (১৭৫০-১৮৫০) হতে ব্রিটেনের অর্থনীতির আধুনিকায়ন শুরু হয়। ফলে ব্রিটেনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। যাহোক, নীচে শিল্পবিপ্লবের ফলাফল আলোচনা করা হলো:

ক. সামাজিক ফলাফল (Social Consequences) : শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটেনের সমাজ ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ গুলো নিম্নরূপ:

১. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি:** শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে যোগাযোগ, পরিবহণ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত পরিবর্তন সূচিত হয়। ফলে ব্রিটেনের শহর অঞ্চলে দিন দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে গ্রাম থেকে শহর অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সন্ধানে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। এছাড়াও, ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও শ্রমিক-কর্মীগণ ব্রিটেনে এসে শিল্পকারখানায় কাজ নেয়। এইভাবে ব্রিটেনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

২. **নগরায়ন:** শিল্পবিপ্লবের ফলে শহর অঞ্চলে নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এতে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। জীবিকা অর্জন ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আগমন করতে থাকে। ফলে ব্রিটেনে নতুন নতুন শহর বা শহরাঞ্চল গড়ে ওঠে।

৩. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন:** শিল্পবিপ্লবের ফলে কারিগরি দক্ষতা ও নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। কারণ, মানুষ তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিত্যনতুন পণ্যসামগ্রী ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্বল্প মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ায় মানুষের জীবনমান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

৪. **পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি:** শিল্পবিপ্লবের ফলে পরিবারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। নতুন নতুন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু শ্রমিকদের শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। এতে পুরুষের পাশাপাশি পরিবারের মেয়েরাও শিল্প-কারখানায় কাজ করতে থাকে। ফলে তাদের পারিবারিক জীবন-যাপনে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৫. **সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন:** শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজের মানুষের নিরাপত্তা রক্ষার্থে ব্রিটিশ সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শ্রমিকদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিক কল্যাণ আইন পাস করে। ফলে নারী ও শিশুশ্রমিকেরা কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পায়। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বেতন ও মজুরির ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া ব্রিটিশ সরকার শ্রমিকদের গুণগত দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য নানামুখী প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

৬. **পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন:** শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটেনের শহর ও গ্রাম পর্যায়ে পরিবহণ ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। কাঁচামাল পরিবহণ ও উৎপাদিত শিল্প পণ্যসামগ্রী পরিবহণের জন্য ব্রিটেনের শহর ও বন্দরের যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করা হয়।

৭. **শ্রেণিবিভাজন বৃদ্ধি:** শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির পুঁজিপতি ও ধনী ব্যক্তির জন্ম হয়। পুঁজিপতিরা কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় শ্রমিকদের মজুরি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে সমাজে দৃশ্যত দুটি ধারার সৃষ্টি হয়। একদিকে থাকে শোষিত গরিব শ্রেণির শ্রমিকরা এবং অন্যদিকে থাকে শোষক শ্রেণির পুঁজিপতিরা।

৮. **শিক্ষার মান উন্নয়ন:**শিল্পবিপ্লবের সময় ব্রিটেনে শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার করা হয়। কারণ, শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকের অভাব দেখা দেয়। সেই চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার করা হয়।

৯. **উদ্যোক্তা শ্রেণি সৃষ্টি:** শিল্পবিপ্লবের ফলে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন করা হয়। বেসরকারিভাবেও ব্যক্তিক পর্যায়ে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এভাবে নতুন নতুন উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়।

১০. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** শিল্পবিপ্লবের ফলে নতুন নতুন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। শিল্প ক্ষেত্রে কার্যসম্পাদনের জন্য প্রচুর পরিমাণে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিল্প মালিকদের দ্বারা ব্যাপক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে কর্মী ও ব্যবস্থাপকের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়।

(খ) অর্থনৈতিক ফলাফল (Economics Consequences): শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়। নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ফলে শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি ক্রয়ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। শিল্পবিপ্লবের ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ভিত্তি স্থাপিত হয় তার সুফল আজও ব্রিটেনে দেখা যায়। শিল্পবিপ্লবের পলে ব্রিটেনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **ব্যবসা উন্নয়ন:**শিল্পবিপ্লবের ফলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায় ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। বস্ত্র, কয়লা ও রাসায়নিক শিল্পের নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয়। তৎকালীন সময়ে ব্রিটেন এসব পণ্যদ্রব্য বিশেষ করে কয়লা ও শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য রফতানি করা হয়। এভাবে ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করে।

২. **কৃষির উপর নেতিবাচক প্রভাব:** শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্যাপক হারে নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অধিকাংশ কৃষি শ্রমিক অধিক উপার্জনের আশায় শিল্পক্ষেত্রে কাজ করতে শুরু করে। এতে কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হয়। মানুষ কৃষি জমি ভরাট করে শিল্পপ্রতিষ্ঠার উদ্যেগ গ্রহণ করে। ফলে জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং জাতীয় উৎপাদনে কৃষির ভূমিকা হ্রাস পায়।

৩. **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ও উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়। এসব উন্নত যন্ত্রপাতির সফল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া বস্ত্র, কয়লা ও রাসায়নিক ক্ষেত্রে উন্নত কাঁচামাল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহারের ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

৪. **কাঠামোগত উন্নয়ন:** শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটেন অবকাঠামোগতভাবে উন্নতি লাভ করে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নতমানের দালান কোঠা, আধুনিক ও উন্নতমানের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নতি লাভ করে।

৫. **ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন:** শিল্পবিপ্লবের ফলে তৎকালীন ব্রিটেনে ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত প্রায়োগিক কৌশলে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এ সময় ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতিগত কৌশলের সঠিক ব্যবহারের ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে ব্রিটেনের অবস্থান শীর্ষে উঠে আসে।

৬. **প্রযুক্তিগত উন্নয়ন:** শিল্পবিপ্লবের ফলে তৎকালীন ব্রিটেনে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে ব্রিটেনে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার এবং তা ব্যবহারের নানাবিধ কৌশল আবিষ্কৃত হয়। শিল্পবিপ্লবের সময় ব্রিটেনে কয়লা ও বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়। এর ফলে পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নতি সাধিত হয়।

৭. **মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি:** শিল্পবিপ্লবের ফলে তৎকালীন ব্রিটেনে শিল্প ও পণ্যদ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ফলে ব্রিটেনের জনগণের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পায়। আর মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

(গ) রাজনৈতিক ফলাফল (Political Consequences): শিল্পবিপ্লবের ফলে তৎকালীন ব্রিটেনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। সে সময় নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজে কিছু পুঁজিপতি ধনাঢ্য ব্যক্তির উত্থান হয়। তাদের হাতেই রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়। নীচে শিল্পবিপ্লবের ফলে বৃদ্ধির রাজনৈতিক ফলাফল তুলে ধরা হলো:

১. **পুঁজিবাদের উন্নয়ন:** শিল্পবিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদের উত্থান হয়। কারণ তখন ব্যক্তি মালিকানায় নতুন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে শিল্প মালিকরা প্রচুর পরিমাণ নগদ টাকার মালিক বনে যায়। শিল্প মালিকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল অধিক মুনাফা অর্জন। সে সময় ব্রিটেনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা নানাবিধ শোষনের শিকার হয়।

২. **শ্রমিক সংঘ উন্নয়ন:** শিল্পবিপ্লবের সময় প্রায় প্রতিটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে একাধিক সংঘের সৃষ্টি হয়। কারণ পুঁজিপতি মালিকদের নানাবিধ শোষনের হাত থেকে রেহাই পেতে শ্রমিকসংঘের উৎপত্তি হয়। এতে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি মানবাধিকারও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. **রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি:** শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রতিষ্ঠানে ট্রেডইউনিয়ন গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে শিল্প শ্রমিকদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। আবার কোনো কোনো দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারনে অন্য দেশ রাজনৈতিকভাবে যেমন: ফ্রান্স দূর্বল হয়, ব্রিটেন হয় শক্তিশালী ।

৪. **দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি:** শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্পকারখানা শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন ব্রিটেনে অধিকাংশ শ্রমিকরা শ্রমিক সংঘে যোগদান করে এবং এতে মালিকের সাথে দরকষাকষির শক্তি অর্জিত হয়।

৫. **বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ:** শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়। জাতি ও ধর্ম ভিত্তিতে বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নানাবিধ মতভেদ দেখা দেয়। কার্যক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ে। তবে তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হতো।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিল্পবিপ্লবের ফলে শুধু ব্রিটেনে নয় সারা বিশ্বেই এর প্রভাব পড়ে। আর এ প্রভাব শুধু ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল না, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব বিদ্যমান। শিল্পবিপ্লব বিশ্বকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

"শিল্পবিপ্লব ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে গতিশীলতা সৃষ্টি করেছিল" - ব্যাখ্যা

"Industrial Revolution Created Dynamism in the Management Development" - Explanation

শিল্পবিপ্লবের ফলে সে সময় ব্রিটেনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। আধুনিক প্রযুক্তি এবং নতুন নতুন উৎপাদন কৌশল প্রয়োগের ফলে সহজেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়। ব্যবস্থাপকরা তুলনামূলক সুবিধা অর্জনের জন্য দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কার্যসম্পাদনে সচেষ্ট হয়। ফলে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে শিল্পবিপ্লবের অন্যান্য অবদানগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. **ব্যবসায়ের উন্নয়ন:** শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রেও গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত প্রয়োগ কৌশল পরিবর্তনের ফলে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সার্বিকভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধিত হয়।

২. **দক্ষ ও যোগ্য ব্যবস্থাপক নিয়োগ:** ব্যবস্থাপনার গতিশীলতা আনয়নের জন্য দক্ষ ও যোগ্য ব্যবস্থাপক নিয়োগ একান্ত জরুরি। কারণ এ দুটো গুণ ব্যতীত কোনো ব্যবস্থাপকের পক্ষে সঠিকরূপে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তৎকালীন ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবের ফলে নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনার সাথে একদল দক্ষও যোগ্য ব্যবস্থাপকেরা জড়িত ছিল। ফলে ব্যবস্থাপনার কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৩. **সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত:** উন্নত ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হলো- সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। শিল্পবিপ্লবের সময়ে ব্রিটেনে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য যথা সময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো এবং কোনো কাজই পরবর্তী সময়ের জন্য ফেলে রাখা হতো না। আধুনিক মানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের কোনো সমস্যা হতো না। এতে কার্যসম্পাদনে গতিশীলতা আসে।

৪. **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন:** শিল্পবিপ্লবের সময় তৎকালীন ব্রিটেনে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হতো। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি পরিচালনা করতেন।

৫. **আধুনিক প্রযুক্তি:** শিল্পবিপ্লবের ফলে একদিকে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারতা বাড়ে, অন্যদিকে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অনেক ধরনের আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়। ব্যবস্থাপকেরা ব্যবস্থাপনার জ্ঞান প্রয়োগ প্রতিষ্ঠানের জটিল সমস্যার সমাধান এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৬. **কাঠামোগত পরিবর্তন:** শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটেনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়ন করা জরুরী হয়ে পড়ে। যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্তে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। বাষ্প ইঞ্জিন ও অন্যান্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে গতিশীলতা লাভ করে।

৭. **গতিশীল নেতৃত্ব: যে-কোনো** প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গতিশীল নেতৃত্বের প্রয়োজন। শিল্পবিপ্লবের ফলে তৎকালীন ব্রিটেনের শিল্পক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য গতিশীল নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। ব্যবস্থাপকগণ নেতৃত্বের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৮. **ব্যবসায় শিক্ষার উন্নয়ন:** শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এরই প্রেক্ষিতে ব্যবসায় স্কুলগুলোতে ব্যবসায় শিক্ষার নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৯. **শ্রম বিভাজন:** শিল্পবিপ্লবকালীন উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় একজন শ্রমিকের পক্ষে সকল কাজ একা একা করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে চার্লস ব্যাবেজ কাজের দক্ষতানুযায়ী শ্রমবিভাজনের নীতি অনুসরণ করতে বলেন। এতে সুফল পাওয়া যায়।

১০. **দক্ষতার ভিত্তিতে মজুরি প্রদান:** শিল্পবিপ্লবের ফলে তৎকালীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে। আর সেই সময় দক্ষ শ্রমিক আকৃষ্ট ও ধরে রাখার জন্য প্রণোদনা হিসাবে দক্ষতার ভিত্তিতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে কর্মরত সকলেই দক্ষতা অর্জনের প্রতিযোগিতা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, তৎকালীন ব্রিটেনের শিল্পক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির গতিশীলতা বৃদ্ধিতে উল্লিখিত উপাদানগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদন থেকে শুরু করে পণ্যদ্রব্য ভোক্তার নিকট পৌছানো পর্যন্ত সবস্তরে গতিশীল নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন হয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। এতে প্রতিষ্ঠানের কাজেকর্মে গতিশীলতা আসে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ শিল্পবিপ্লবের ফলাফল ও ব্যবস্থাপনায় শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা সম্পর্কে খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

শিল্পবিপ্লব বিশ্বের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে ব্রিটেনের অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির প্রতিটি স্তরে গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবস্থাপনা বিশারদদের মতে শিল্পবিপ্লবের সময় (১৭৫০-১৮৫০) হতে ব্রিটেনের অর্থনীতির আধুনিকায়ন শুরু হয়। ফলে ব্রিটেনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে সে সময় ব্রিটেনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। আধুনিক প্রযুক্তি এবং নতুন নতুন উৎপাদন কৌশল প্রয়োগের ফলে সহজেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়। ব্যবস্থাপকরা তুলনামূলক সুবিধা অর্জনের জন্য দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কার্যসম্পাদনে সচেষ্ট হয়। ফলে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

পাঠ-১.৯ শিল্পবিপ্লবের সীমাবদ্ধতা; সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ, শিল্পের উন্নয়নের ধারা ১.০ থেকে ৪.০

Limitations/Problems of Industrial Revolution; Steps Taken for Removing demerits of Industrial Revolutions; The Evolution of Industry : Industry 1.0 to 4.0

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- শিল্পবিপ্লবের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- শিল্পবিপ্লবের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্পের উন্নয়নের ধারা ১.০ থেকে ৪.০ এর বিবরণ দিতে পারবেন।

শিল্পবিপ্লবের সীমাবদ্ধতা/সমস্যা

Limitations/Problems of Industrial Revolution

শিল্পবিপ্লব সংগঠিত হয়েছে ব্রিটেনে কিন্তু এর প্রভাবে বিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি মানব জাতির জীবনধারারও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। বিপরীত দিক থেকে এর প্রভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো নিম্নরূপ:

১. **কৃষির উপর নেতিবাচক প্রভাব:** শিল্পবিপ্লবের ফলে দ্রুত নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং কৃষকগণ বেশি উপার্জনের আশায় কৃষি কাজ পরিত্যাগ করে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করে। ফলে কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এছাড়াও মানুষ কৃষিজমি ভরাট করে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান হ্রাস পায়।

২. **পুঁজিবাদের সমস্যা:** শিল্পবিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদ ও শ্রমের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সময় ব্যক্তি মালিকানায় নতুন নতুন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিল্পমালিকরা প্রচুর নগদ টাকার মালিক বনে যায়। শিল্পমালিকদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল অধিক মুনাফা অর্জন করা। এতে ব্রিটেনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা নানাবিধ শোষণের শিকার হয়।

৩. **চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অসমতা:** ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্পমালিকরা চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা বিধান করতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। কারণ একদিকে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে বাজারের পরিধিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা বিধান করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

৪. **মূলধনের সমস্যা:** শিল্পবিপ্লবের ফলে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ও উন্নতমানের বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির উদ্ভব হয়। প্রযুক্তি নির্ভরতার কারণে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রচুর পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে মূলধণের অভাব দেখা দেয় এবং নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাই দেখা যায় যে, শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মূলধনের অভাবে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে কার্যাবলি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়।

৫. **শ্রেণিবিভাজন বৃদ্ধি:** শিল্পবিপ্লব পুঁজিবাদের জন্ম দেয়। এতে শ্রমিক ও নিম্নশ্রেণির লোকেরা ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা শোষণ এর শিকার হয়। পুঁজিপতি মালিকরা কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় শ্রমিকদের মজুরি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে গড়িমসি করে। ফলে সমাজে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়- একপক্ষ হলো পুঁজিপতিরা ও অপর পক্ষ হলো শোষিত শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের মানুষ।

৬. **পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব:** শিল্পবিপ্লবের ফলে নতুন নতুন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরিবেশের উপর বিভিন্নভাবে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। শিল্পকারখানার কালো ধোঁয়া পরিবেশের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাবের সৃষ্টি করে। এ ছাড়া ক্রমাগতভাবে নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠার ফলে শহরে জনসংখ্যার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার

ফলে অতিরিক্ত পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাসের চাহিদা পূরণের জন্য পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে কারণে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৭. **ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীলতা:** শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কারখানার মালিকরা পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কারণ, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ব্যবসায়ীরা মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। পণ্যের উৎপাদন স্থল থেকে ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রম মূলত ব্যবসায়ীরা জড়িত থাকে। ফলে কারখানার মালিকরা পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য অনেকাংশে ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৮. **জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি:** শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্যক্তি জীবনের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিলাসী জীবনযাপনের দিক ঝোঁক বাড়ে। ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৯. **পারিবারিক সমস্যা:** শিল্পবিপ্লবের ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় ও ব্যক্তিগত চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নারীদের কাজের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এতে তারা শহরমুখী হয়। ফলে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে যায় ও পারিবারিক জীবনে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়।

১০. **অদক্ষ শ্রমিকদের সমস্যা:** শিল্পবিপ্লবের ফলে কলকারখানায় দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে মালিকেরা অদক্ষ শ্রমিকদেরকে হয় মজুরি কমিয়ে দেয়, না হয় ছাঁটাই করে। এতে করে অদক্ষ শ্রমিকদের সমস্যার সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিল্পবিপ্লব জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু নেতিবাচক প্রভাবও সৃষ্টি করেছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে সকলেই তাদের পুঁজি শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। ফলে কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। শিল্পবিপ্লবের ফলে দূষণের মাধ্যমে পরিবেশের উপরও প্রভাব ফেলে।

শিল্পবিপ্লবের কুফল দূরীকরণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলি
অথবা, শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান

Steps Taken for Removing Demerits of Industrial Revolutions
Or, Resolving Problems Arising out of Industrial Revolutions

শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। শুধু সেখানেই নয় এর ফলে সার বিশ্বেই ব্যবসায় ও বাণিজ্য ও বিপণন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে ব্রিটেনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সকল নেতিবাচক প্রভাব দূর করার জন্য তৎকালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। নীচে এগুলো তুলে ধরা হলো:

১. **বিস্তৃত কৃষি পরিকল্পনা:** আমরা জানি যে, শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্যাপকভাবে নতুন নতুন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রমিকরা শহরমুখী হতে শুরু করে। এতে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বল্পতা দেখা দেয় এবং উৎপাদন ব্যহত হয়। এমতাবস্থায়, কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে চাষাবাদের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ফলে কৃষিক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

২. **পুঁজিবাদের ব্যবহার:** শিল্পবিপ্লবের ফলে ক্ষুদ্র শিল্প ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে এবং বৃহৎ শিল্প ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান দখল করে। ফলে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। এতে শ্রমিকশ্রেণি এবং গরীবরা শোষিত হতে থাকে। এতে শ্রেণিবৈষম্য বাড়তে থাকে। শোষণ অবসানের লক্ষ্যে Tom Paine তার "Rights of Man" নামক গ্রন্থে সমাজ সংস্কারের পক্ষে জোড়ালো বক্তব্য রাখেন। ১৭৯২ সালে Thomas Hardy সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হতে শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এবং সামাজিক সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য আন্দোলন ও প্রতিবাদ চলতে থাকে। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার ১৮০০ সালে Combination আইনের মাধ্যমে শ্রমিকসংঘকে বাতিল বলে ঘোষণা করে। এমতাবস্থায়, শ্রমিক আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়। অত:পর পুঁজিবাদের প্রতিকারের জন্য সরকার সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

৩. **শিশুশ্রম নিরোধ আইন প্রণয়ন:** শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদন, শ্রমিকের চাহিদা ও মজুরি বাড়ে। ফলে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও ছোটো ছেলে-মেয়েরা উপার্জনের উদ্দেশ্যে শিল্প-কারখানার কাজে যোগ দেয় যা শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে। পরবর্তীকালে উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটেনে সরকার আইন পাস করে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করেন।

৪. **বেকার ভাতার প্রবর্তন:**শিল্পবিপ্লবোত্তর পরিস্থিতিতে বেশ কিছু সংখ্যক সাধারণ ও প্রকৌশল শিল্পের শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এ সমস্যা উত্তরণে সরকার গৃহ নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ ও প্রকৌশল শিল্পের শ্রমিকদের জন্য বেকারভাতা প্রবর্তন করেন।

৫. **স্বাস্থ্যবিমা আইন প্রণয়ন:** সরকার স্বাস্থ্যবিমা আইন প্রণয়ন করে শ্রমিকদের শারীরিক অসুস্থতা ও অক্ষমতায় সাহায্য করে। এ প্রকল্পে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কতিপয় ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয়। যেমন:

ক. স্বাস্থ্যবিমায় বিমাকৃত শ্রমিকগণকে বিনা খরচে চিকিৎসা ও ঔষধভাতা প্রদান।
খ. অসুস্থতার জন্য ২৬ তম সপ্তাহ শেষে অক্ষমতা ভাতা প্রদান।
গ. শ্রমিকের স্ত্রীকে প্রসূতিভাতা বাবদ ৩০ শিলিং করে প্রদান।
ঘ. বিমাকৃত ব্যক্তি রোগ-ব্যাধিতে অসুস্থ হলে নারী শ্রমিক ৭.৫০ শিলিং এবং পুরুষ শ্রমিককে ১০ শিলিং করে অসুস্থতা ভাতা প্রদান ইত্যাদি।

৬. **বার্ধক্যভাতা প্রদান:** শিল্পবিপ্লব পরবর্তীকালে বার্ধক্যজনিত কারণে কিংবা শারীরিক অক্ষমতার কারণে চাকুরি থেকে অবসর নেওয়া শ্রমিকদেরকে মাথা পিছু ৫ শিলিং করে বার্ধক্যজনিত ভাতা প্রদান করা হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বৃটিশ সরকার কর্তৃক উল্লিখিত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয়। এতে শ্রমিক সমাজের দুর্দশা কিছু সময়ের জন্য হলেও লাঘব হয়।

শিল্পের ক্রমবিবর্তনের ধারা: শিল্প ১.০ থেকে ৪.০

The Evolution of Industry : Industry 1.0 to 4.0

শত শত বছর ধরে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী, যেমন: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মানুষ হাতেই তৈরি করতো। ১৯ শতকের শুরুতে শিল্প ১.০ শুরু হওয়ায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং তখন থেকে কার্যক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন ঘটে। নীচে শিল্প ১.০ থেকে শিল্প ৪.০ পর্যন্ত ধারণা তুলে ধরা হলো:

			চিত্র
		চিত্র	শিল্পঃ ৪.০
	চিত্র	শিল্পঃ ৩.০	
চিত্র	শিল্পঃ ২.০		
শিল্প ১.০			
যান্ত্রিকীকরণ, বাষ্পীয় শক্তি, বুনন লুম	বৃহদায়তন উৎপাদন, সংযুক্তকরণ, বৈদ্যুতিক শক্তি	স্বয়ংক্রিয়করণ, কম্পিউটারের ব্যবহার, ইলেকট্রনিক ব্যবহার	সাইবার সিস্টেম, ইন্টারনেট যুক্তকরণ, নেটওয়ার্ক স্থাপন

১. **শিল্প - ১.০:** ১৮ শতকে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের সহযোগিতার জন্য পানি ও বাষ্পীয় শক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ব্যবসায় সম্প্রসারিত হয়। এতে শিল্প ঘরে সীমাবদ্ধ না থেকে সংগঠনে রূপ নেয়। ফলে প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও ক্রেতাদেরকে সেবা প্রদানের জন্য মালিক, ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের প্রয়োজন পড়ে।

২ **শিল্প - ২.০:** বিশ শতকের শুরুতে শিল্পক্ষেত্রে শক্তির প্রধান উৎস হলো বিদ্যুৎ। এটি পানি ও বাষ্প শক্তির চেয়ে সহজ এবং সহজেই প্রতিটি যন্ত্রে এটি সংযোগ দেওয়া যায়; এমনকি মালিকগণ নিজের সুবিধামত নকশাকরণ করে থাকে যেন সহজেই একস্থান হতে অন্যস্থানে বহন করা যায়। এ সময়ে অনেকগুলো ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রামের উন্নয়ন সাধন করা হয় যেন উৎপাদন কার্যক্রম দক্ষ কার্যকরীভাবে চালিয়ে যাওয়া যায়। এ সময় 'শ্রমবিভাজন' নীতি চালু হয়। ফলে একজন শ্রমিক কাজের একটি অংশ সম্পন্ন করে। এতে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। সংযুক্তকরণ শিল্পের মাধ্যমে বৃহদায়তন

উৎপাদন সম্ভব হয়। এ সময় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক এফ ডব্লিও টেলর প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করেন। এতে উৎপাদন ও মান দুটোই বৃদ্ধি পায়।

৩. শিল্প - ৩.০: বিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়। যেমন: রেডিও, পরবর্তীকালে সংযুক্ত সার্কিট চিপস (Integrated Circuit Chips)। এ গুলো প্রতিটি মেশিনকে আরও শক্তিশালী করে ব্যবহার করতে সাহায্য করে। এ সময়ে বিভিন্ন সফটওয়্যার চালু হয়। এতে করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমন্বিত পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। এতে কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ, প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ, মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রভৃতি কঠিন কাজ সহজভাবে করা যায়। সংযুক্তকরণ শিল্প চালু হওয়ার ফলে তুলনামূলকভাবে কম খরচে যে দেশে উৎপাদন করা সম্ভব, সে সকল দেশে এ শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কম খরচে পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এ সময় সরবরাহ শিকল ব্যবস্থাপনা (SCM) ধারণার জন্ম হয়।

৪. শিল্প - ৪.০: ২১ শতকে শিল্প ৪.০ চালু হয়। এতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার সংযুক্ত করা হয় যেন তথ্য আদান-প্রদান ও বিশ্লেষণ করা যায় এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে তা ব্যবহার করা যায়। এ সময় উৎপাদন বাড়ানোর জন্য রোবট প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা হয়। শিল্প ৪.০ এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার করা। বিশ শতকের শেষের দিকে কিছু কর্মসূচি উন্নয়নের চিন্তা করা হয়, যা একুশ শতকে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যেমন: উৎপাদন বাস্তবায়ন সিস্টেম, সপ্ ফ্লোর কন্ট্রোল, পণ্যের জীবনচক্র ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি। নীচে চিত্রের মাধ্যমে ৪.০ তুলে ধরা হলো:

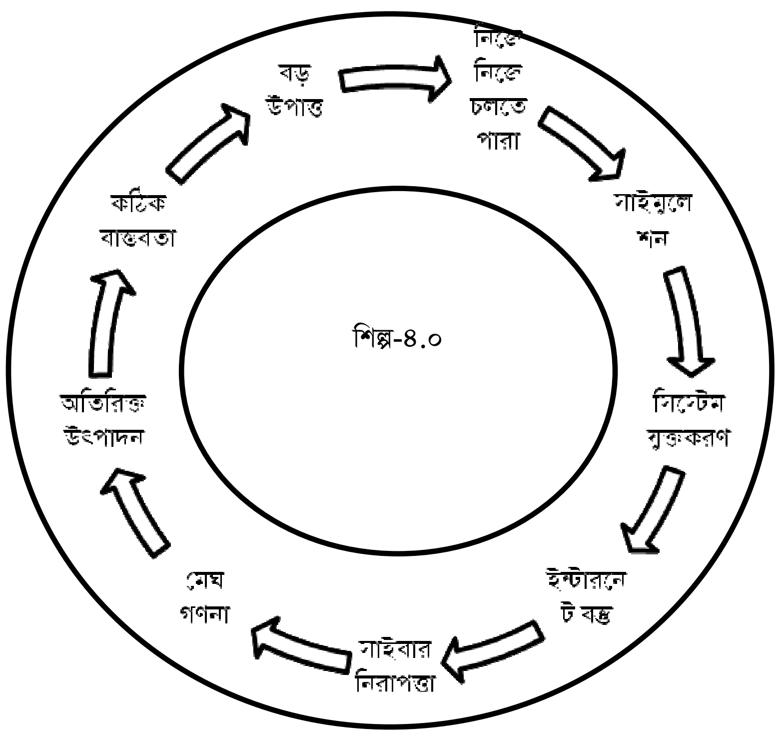

চিত্র: শিল্প ৪.০ এর অবস্থান

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ শিল্পবিপ্লবের ফলে উদ্ভূত সমস্যা ও তা সমাধানের উপায় এবং শিল্পের ক্রমবিবর্তনের ধারা সম্পর্কে এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

শিল্পবিপ্লব সংগঠিত হয়েছে ব্রিটেনে কিন্তু এর প্রভাবে বিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি মানব জাতির জীবনধারাও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। বিপরীত দিক থেকে এর প্রভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয় তা হলো- কৃষির উপর নেতিবাচক প্রভাব, পুঁজিবাদের সমস্যা, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অসমতা, শ্রেণি বিভাজন বৃদ্ধি, পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব, ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীলতা, পারিবারিক সমস্যা, অদক্ষ শ্রমিকদের সমস্যা প্রভৃতি। এ সকল সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় হলো- বিস্তৃত কৃষি পরিকল্পনা, শিশুশ্রম নিরোধ আইন, বেকারভাতা প্রবর্তন, স্বাস্থ্যবিমা চালু, বার্ধক্যভাতা প্রদান প্রভৃতি। শিল্পের ক্রম বির্তনের ধারা হলোঃ শিল্প - ১.০ঃ যান্ত্রিকীকরণ, বাস্পীয় শক্তি, বুনন লুমবৃহদায়তন, শিল্প- ২.০ঃ উৎপাদন, সংযুক্তকরণ, বৈদ্যুতিক শক্তি, শিল্প - ৩.০ঃ স্বয়ংক্রিয়করণ, কম্পিউটারের ব্যবহার ইলেকট্রনিক ব্যবহার, শিল্প - ৪.০ঃ সাইবার সিস্টেম, ইন্টারনেট যুক্তকরণ, নেটওয়ার্ক স্থাপন।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. ‘ব্যবস্থাপক’ শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখুন।
২. ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়?
৩. শাস্ত্র হিসাবে ব্যবস্থাপনা অধ্যয়নের গুরুত্ব কী?
৪. ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৫. ‘ব্যবস্থাপক’ কে? ব্যাখ্যা করুন।
৬. ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বলতে কী বুঝায়?
৭. ব্যবস্থাপনা মতবাদ বা তত্ত্বের উপর প্রভাবক শক্তিসমূহ আলোচনা করুন।
৮. ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।
৯. ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা উন্নয়নের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
১০. ব্যবস্থাপনা স্কুল কী? ব্যবস্থাপনা স্কুলের শ্রেণিবিন্যাস লিখুন।
১১. শিল্পবিপ্লব কী? এ সময়ের ব্যবস্থা কেমন ছিল?
১২. ধ্রুপদী মতবাদ কী? ধ্রুপদী মতবাদের উপাদানসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
১৩. নব্য-ধ্রুপদী মতবাদ কী? নব্য-ধ্রুপদী মতবাদের ধরনসমূহ আলোচনা করুন।
১৪. আধুনিক মতবাদ কী? আধুনিক মতবাদের ধরনসমূহ বর্ণনা করুন।
১৫. ব্যবস্থাপনা দর্শন কাকে বলে? ব্যবস্থাপনা দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।
১৬. বিভিন্ন সময়ে ব্যবস্থাপনা ধারণার উন্নয়নে অবদানকারীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
১৭. এলটন মেয়ো কী ছিলেন? হর্থন গবেষণা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিন।
১৮. উইলিয়াম ওচি কে ছিলেন? ‘Z’ তত্ত্ব আলোচনা করুন।
১৯. শিল্পবিপ্লব বলতে কী বুঝায়? শিল্পবিপ্লবের কারণসমূহ বর্ণনা করুন।
২০. শিল্পবিপ্লবের সময় বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২১. শিল্পবিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা করুন।
২২. শিল্পবিপ্লবের সীমাবদ্ধতা ও সেগুলো দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।

তথ্য সূত্রঃ

- Kathryn M. Bartol & David C. Martin, “Management”, 2nd Edition, McGraw-Hill, INC, Newyork, 1994.
- Ricky W. Griffin, “Management” , (12th ed), AITBS publication, New Delhi.
- Heinz Weihrich & Harold Koontz, “Management”, 10th Edition, McGraw-Hill, INC, USA, 1994.